সাহিত্যচর্চা

উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্য সংকলন

বাংলা ক । একাদশ শ্রেণি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক আনুকূল্যে একাদশ শ্রেণির
ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।
বিক্রয়যোগ্য নয়।

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ

প্রথম উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ সংস্করণ
এপ্রিল, ২০১৬

প্রকাশক
অধ্যাপক সুব্রত ঘোষ
সচিব, পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ

মুদ্রক
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশিচমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যাঁদের অনুমতিতে নিম্নলিখিত রচনাগুলি প্রকাশ করা সম্ভব হল তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

মৃণ্ময় মিত্র (তেলেনাপোতা আবিষ্কার : প্রেমেন্দ্র মিত্র),
ড. গৌতম ভাদুড়ী (ডাকাতের মা : সতীনাথ ভাদুড়ী),
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ (গালিলিও : সত্যেন্দ্রনাথ বসু),
কল্যাণী কাজী (দ্বীপান্তরের বন্দিনী : কাজী নজরুল ইসলাম)
জয় গোস্বামী (নুন : জয় গোস্বামী),
দে'জ পাবলিশিং (বিশাল ডানাওয়ালা থুরথুরে বুড়ো : গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ/ অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়),
সাহিত্য অকাদেমি (শিক্ষার সার্কাস : আইয়াপ্পা পানিকর/ অনুবাদ : উৎপলকুমার বসু)।

ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে **সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র** রূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে **সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার, চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম** এবং **উপাসনার স্বাধীনতা; সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা** এবং তাদের সকলের মধ্যে **ব্যক্তির মর্যাদা** এবং **জাতীয় ঐক্য** ও **সংহতি** সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যাতে **ভ্রাতৃত্বের ভাব,** গড়ে ওঠে তার জন্য সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে, **আমাদের গণপরিষদে,** আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, এতদ্দ্বারা এই **সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ** এবং **নিজেদের অর্পণ** করছি।

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a **SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC AND TO SECURE TO ALL ITS CITIZENS :**

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;
EQUALITY of status and of opportunity and to promote among them all;

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation;

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November 1949, do **HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.**

মুখবন্ধ

পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় শিক্ষাদপ্তরের 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-কর্তৃক নির্মিত এবং পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ প্রকাশিত 'সাহিত্যচর্চা' সংকলনটি নবকলেবরে পরিবেশন করা হল। একাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নির্মিত এই সংকলনটি বাংলা প্রথম ভাষা (ক)-এর পাঠ্যপুস্তক। নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী প্রকাশিত 'সাহিত্যচর্চা' সংকলনটির মূল উদ্দেশ্য হল বর্তমান প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রীদের বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধ ভাণ্ডারের সঙ্গে পরিচয় করানো। আমাদের সেই উদ্দেশ্য কিছুটা হলেও সফল হয়েছে। একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা এই সংকলনের মাধ্যমে শুধু বাংলা সাহিত্যই নয়, ভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক সাহিত্যেরও আস্বাদ পাচ্ছে। এখানে গতানুগতিকতা বা একঘেয়েমি এড়াতে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ রাখা হয়েছে। একই মলাটের মধ্যে আনা হয়েছে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা অর্থাৎ গদ্য, পদ্য, প্রবন্ধ, বড়ো গল্প ইত্যাদি।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জীর উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাদপ্তরের অনুদানে এই বইটি ২০১৬ সাল থেকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে।

সংকলনটিতে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানবিধি অনুসৃত হয়েছে। সংকলনটি প্রকাশে যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের প্রত্যেককে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

এপ্রিল, ২০১৬
বিদ্যাসাগর ভবন

ড. মহুয়া দাস
সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ

প্র স্তা ব না

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে গঠিত বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের যৌথ প্রচেষ্টায় নির্মিত এবং রাজ্য সরকার দ্বারা অনুমোদিত 'বাংলা : প্রথম ভাষা' পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী একাদশ শ্রেণির জন্য নির্বাচিত গদ্য, প্রবন্ধ, কবিতা ও নাটক ইত্যাদির সংকলন প্রকাশিত হল।

বাংলা সাহিত্যের বিপুল বৈচিত্র্যের প্রতিফলনের পাশাপাশি ভারতের অন্যান্য ভাষাসাহিত্য ও আন্তর্জাতিক সাহিত্যের বিষয়ও এ সংকলনে স্থান পেয়েছে। একই সঙ্গে রয়েছে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ হিসেবে পাঠ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক 'গুরু'। ছাত্রছাত্রীদের বয়সের কথা মাথায় রেখে জোর দেওয়া হয়েছে আধুনিকতম সাহিত্যের উপর, কিন্তু তা বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যকে ভুলে নয়।

সম্পূর্ণ নতুন এই সংকলনটির সঙ্গে প্রশ্নকাঠামো আর নম্বর বিভাজনেও এসেছে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন। শুরু হয়েছে প্রকল্প রচনার অভ্যাস। ২০১৩ সাল থেকে এই নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যবই শ্রেণিকক্ষে প্রযুক্ত হওয়ার পর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে প্রথম ভাষা বাংলার ক্ষেত্রে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। এই পরিবর্তনকে আরো গভীরতর ও সর্বাঙ্গীন করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার এই বইটি ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিনামূল্যে পৌঁছে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। এই প্রয়াসের জন্য রাজ্য সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জীর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতা জানাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরকেও।

সংকলনটির প্রকাশের ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতা জানাই অধ্যাপিকা ড. মহুয়া দাস এবং অধ্যাপক ড. সুব্রত ঘোষ মহাশয়কে। এছাড়াও যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

এপ্রিল, ২০১৬
নিবেদিতা ভবন

অভীক মজুমদার
চেয়ারম্যান
বিশেষজ্ঞ কমিটি, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

অভীক মজুমদার
(চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

মহুয়া দাস
(সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ)

রথীন্দ্রনাথ দে
(সদস্য-সচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

সুব্রত ঘোষ
(সচিব, পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ)

স দ স্য

ঋত্বিক মল্লিক রুদ্রশেখর সাহা

প্র চ্ছ দ

সুব্রত মাজী

রূ পা য় ণ

বিপ্লব মণ্ডল

সূ|চি|প|ত্র

গল্প		**১-১৪**
কর্তার ভূত	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩
তেলেনাপোতা আবিষ্কার	প্রেমেন্দ্র মিত্র	৬
ডাকাতের মা	সতীনাথ ভাদুড়ী	১৪
প্রবন্ধ		**২১-৩৪**
সুয়েজখালে : হাঙ্গর শিকার	স্বামী বিবেকানন্দ	২৩
গালিলিও	সত্যেন্দ্রনাথ বসু	২৯
কবিতা		**৩৫-৪৫**
নীলধ্বজের প্রতি জনা	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	৩৭
বাড়ির কাছে আরশিনগর	লালন ফকির	৪০
দ্বীপান্তরের বন্দিনী	কাজী নজরুল ইসলাম	৪১
নুন	জয় গোস্বামী	৪৪
আন্তর্জাতিক গল্প		**৪৫-৫৪**
বিশাল ডানাওয়ালা এক থুরথুরে বুড়ো	গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ	৪৭
ভারতীয় কবিতা		**৫৫-৫৮**
শিক্ষার সার্কাস	আইয়াপ্পা পানিকর	৫৭
পূর্ণাঙ্গ সহায়ক গ্রন্থ		**৫৯-৯৬**
গুরু	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬১
পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যসূচি		৯৭

গল্প

কর্তার ভূত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

বুড়ো কর্তার মরণকালে দেশসুদ্ধ সবাই বলে উঠল, 'তুমি গেলে আমাদের কী দশা হবে।'

শুনে তারও মনে দুঃখ হল। ভাবলে, 'আমি গেলে এদের ঠান্ডা রাখবে কে।'

তা বলে মরণ তো এড়াবার জো নেই। তবু দেবতা দয়া করে বললেন, 'ভাবনা কী। লোকটা ভূত হয়েই এদের ঘাড়ে চেপে থাক না। মানুষের মৃত্যু আছে, ভূতের তো মৃত্যু নেই।'

২

দেশের লোক ভারি নিশ্চিন্ত হল।

কেন না ভবিষ্যৎকে মানলেই তার জন্যে যত ভাবনা, ভূতকে মানলে কোনো ভাবনাই নেই; সকল ভাবনা ভূতের মাথায় চাপে। অথচ তার মাথা নেই, সুতরাং কারও জন্যে মাথাব্যথাও নেই।

তবু স্বভাবদোষে যারা নিজে ভাবতে যায় তারা খায় ভূতের কানমলা। সেই কানমলা না যায় ছাড়ানো, তার থেকে না যায় পালানো, তার বিরুদ্ধে না চলে নালিশ, তার সম্বন্ধে না আছে বিচার।

দেশসুদ্ধ লোক ভূতগ্রস্ত হয়ে চোখ বুজে চলে। দেশের তত্ত্বজ্ঞানীরা বলেন, 'এই চোখ বুজে চলাই হচ্ছে জগতের সব চেয়ে আদিম চলা। একেই বলে অদৃষ্টের চালে চলা। সৃষ্টির প্রথম চক্ষুহীন কীটাণুরা এই চলা চলত; ঘাসের মধ্যে, গাছের মধ্যে, আজও এই চলার আভাস প্রচলিত।'

শুনে ভূতগ্রস্ত দেশ আপন আদিম আভিজাত্য অনুভব করে। তাতে অত্যন্ত আনন্দ পায়।

ভূতের নায়েব ভুতুড়ে জেলখানার দারোগা। সেই জেলখানার দেয়াল চোখে দেখা যায় না। এইজন্যে ভেবে পাওয়া যায় না, সেটাকে ফুটো করে কী উপায়ে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব।

এই জেলখানায় যে ঘানি নিরন্তর ঘোরাতে হয় তার থেকে এক ছটাক তেল বেরোয় না যা হাটে বিকোতে পারে, বেরোবার মধ্যে বেরিয়ে যায় মানুষের তেজ। সেই তেজ বেরিয়ে গেলে মানুষ ঠান্ডা হয়ে যায়। তাতে করে ভূতের রাজত্বে আর কিচ্ছুই না থাক—অন্ন হোক, বস্ত্র হোক, স্বাস্থ্য হোক—শান্তি থাকে।

কত-যে শান্তি তার একটা দৃষ্টান্ত এই যে, অন্য সব দেশে ভূতের বাড়াবাড়ি হলেই মানুষ অস্থির হয়ে ওঝার খোঁজ করে। এখানে সে চিন্তাই নেই। কেন-না ওঝাকেই আগেভাগে ভূতে পেয়ে বসেছে।

৩

এই ভাবেই দিন চলত, ভূতশাসনতন্ত্র নিয়ে কারও মনে দ্বিধা জাগত না; চিরকালই গর্ব করতে পারত যে, এদের ভবিষ্যৎটা পোষা ভেড়ার মতো ভূতের খোঁটায় বাঁধা, সে ভবিষ্যৎ ভ্যা'ও করে না, ম্যা'ও করে না, চুপ করে পড়ে থাকে মাটিতে, যেন একেবারে চিরকালের মতো মাটি।

কেবল অতি সামান্য একটা কারণে একটু মুশকিল বাধল। সেই হচ্ছে এই যে, পৃথিবীর অন্য দেশগুলোকে ভূতে পায়নি। তাই অন্য সব দেশে যত ঘানি ঘোরে তার থেকে তেল বেরোয় তাদের ভবিষ্যতের রথচক্রটাকে সচল করে রাখবার জন্যে, বুকের রক্ত পিষে ভূতের খর্পরে ঢেলে দেবার জন্যে নয়। কাজেই মানুষ সেখানে একেবারে জুড়িয়ে যায়নি। তারা ভয়ংকর সজাগ আছে।

৪

এদিকে দিব্যি ঠান্ডায় ভূতের রাজ্য জুড়ে 'খোকা ঘুমোল, পাড়া জুড়োল'।

সেটা খোকার পক্ষে আরামের, খোকার অভিভাবকের পক্ষেও; আর পাড়ার কথা তো বলাই আছে।

কিন্তু, 'বর্গি এল দেশে'।

নইলে ছন্দ মেলে না, ইতিহাসের পদটা খোঁড়া হয়েই থাকে।

দেশে যত শিরোমণি চূড়ামণি আছে সবাইকে জিজ্ঞাসা করা গেল, 'এমন হল কেন।'

তারা এক বাক্যে শিখা নেড়ে বললে, 'এটা ভূতের দোষ নয়, ভুতুড়ে দেশের দোষ নয়, একমাত্র বর্গিরই দোষ। বর্গি আসে কেন।'

শুনে সকলেই বললে, 'তা তো বটেই।' অত্যন্ত সান্ত্বনা বোধ করলে।

দোষ যারই থাক, খিড়কির আনাচে-কানাচে ঘোরে ভূতের পেয়াদা, আর সদরের রাস্তায়-ঘাটে ঘোরে অভূতের পেয়াদা; ঘরে গেরস্তর টেঁকা দায়, ঘর থেকে বেরোবারও পথ নেই। এক দিক থেকে এ হাঁকে, 'খাজনা দাও'। আর-এক দিক থেকে ও হাঁকে, 'খাজনা দাও।'

এখন কথাটা দাঁড়িয়েছে 'খাজনা দেব কীসে।'

এতকাল উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে নানা জাতের বুলবুলি এসে বেবাক ধান খেয়ে গেল, কারও হুঁশ ছিল না। জগতে যারা হুঁশিয়ার এরা তাদের কাছে ঘেঁষতে চায় না, পাছে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। কিন্তু, তারা অকস্মাৎ এদের অত্যন্ত কাছে ঘেঁষে এবং প্রায়শ্চিত্তও করে না। শিরোমণি-চূড়ামণির দল পুঁথি খুলে বলেন, 'বেহুঁশ যারা তারাই পবিত্র, হুঁশিয়ার যারা তারই অশুচি, অতএব হুঁশিয়ারদের প্রতি উদাসীন থেকো, প্রবুদ্ধমিব সুপ্তঃ।'

শুনে সকলের অত্যন্ত আনন্দ হয়।

৫

কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ প্রশ্নকে ঠেকানো যায় না 'খাজনা দেব কীসে'।

শ্মশান থেকে মশান থেকে ঝোড়ো হাওয়ায় হা হা করে তার উত্তর আসে, 'আব্রু দিয়ে, ইজ্জত দিয়ে, ইমান দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে।'

প্রশ্নমাত্রেরই দোষ এই যে, যখন আসে একা আসে না। তাই আরো একটা প্রশ্ন উঠে পড়েছে, 'ভূতের শাসনটাই কি অনন্তকাল চলবে।'

শুনে ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি আর মাসতুতো-পিসতুতোর দল কানে হাত দিয়ে বলে, 'কী সর্বনাশ। এমন প্রশ্ন তো বাপের জন্মে শুনিনি। তা হলে সনাতন ঘুমের কী হবে—সেই আদিমতম, সকল জাগরণের চেয়ে প্রাচীনতম ঘুমের?'

প্রশ্নকারী বলে, 'সে তো বুঝলুম, কিন্তু আধুনিকতম বুলবুলির ঝাঁক আর উপস্থিততম বর্গির দল, এদের কী করা যায়।'

মাসিপিসি বলে, 'বুলবুলির ঝাঁককে কৃষ্ণনাম শোনাব, আর বর্গির দলকেও।'

অর্বাচীনেরা উদ্ধত হয়ে বলে ওঠে, 'যেমন করে পারি ভূত ছাড়াব।'

ভূতের নায়েব চোখ পাকিয়ে বলে, 'চুপ। এখনো ঘানি অচল হয়নি।'

শুনে দেশের খোকা নিস্তব্ধ হয়, তার পরে পাশ ফিরে শোয়।

৬

মোদ্দা কথাটা হচ্ছে, বুড়ো কর্তা বেঁচেও নেই, মরেও নেই, ভূত হয়ে আছে। দেশটাকে সে নাড়েও না, অথচ ছাড়েও না।

দেশের মধ্যে দুটো-একটা মানুষ, যারা দিনের বেলা নায়েবের ভয়ে কথা কয় না, তারা গভীর রাত্রে হাত জোড় করে বলে, 'কর্তা, এখনো কি ছাড়বার সময় হয়নি।'

কর্তা বলেন, 'ওরে অবোধ, আমার ধরাও নেই, ছাড়াও নেই, তোরা ছাড়লেই আমার ছাড়া।'

তারা বলে, 'ভয় করে যে কর্তা।'

কর্তা বলেন, 'সেইখানেই তো ভূত।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) : জন্ম কলকাতার জোড়াসাঁকোয়। তিনি একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক ও গীতিকার। বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রধান রূপকারদের একজন। শিক্ষা বিষয়ে তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তা জন্ম দিয়েছিল শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ের, যা পরে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ পায়। ১৯১৩ সালে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। অন্ধ গোঁড়ামির বিরোধিতা ও নতুন ভাবনাকে স্বাগত জানানো তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্য। মাত্র ষোলো বছর বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ *ভারতী*, *হিতবাদী*, *সাধনা* প্রভৃতি পত্রিকার জন্য ছোটোগল্প লিখতে শুরু করেন। শিলাইদহে (বর্তমানে বাংলাদেশে) জমিদারি পরিদর্শনকালে তিনি খুব কাছ থেকে গ্রামীণ বাংলা ও সাধারণ মানুষের জীবন পর্যবেক্ষণ করেন। গ্রামবাংলার সাধারণ জীবনের সেই অপরূপতা ফুটে উঠেছে তাঁর বিভিন্ন ছোটোগল্পে। তাঁর লেখা ছোটোগল্পগুলির মধ্যে রয়েছে *দেনাপাওনা*, *কাবুলিওয়ালা*, *গুপ্তধন*, *খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন*, *ক্ষুধিত পাষাণ*, *ছুটি*, *ল্যাবরেটরী*, *সুভা*, *নষ্টনীড়*, *অতিথি*, *খাতা*, *হৈমন্তী*, *বলাই*, *পোস্টমাস্টার*, *মধ্যবর্তিনী* প্রভৃতি। তাঁর রচিত ছোটোগল্পগুলি 'গল্পগুচ্ছ' সংকলনগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

তেলেনাপোতা আবিষ্কার

প্রেমেন্দ্র মিত্র

শনি ও মঙ্গলের, মঙ্গলই হবে বোধ হয়, যোগাযোগ হলে তেলেনাপোতা আপনারাও একদিন আবিষ্কার করতে পারেন। অর্থাৎ কাজে কর্মে মানুষের ভিড়ে হাঁফিয়ে ওঠার পর যদি হঠাৎ দু-দিনের জন্যে ছুটি পাওয়া যায়, আর যদি কেউ এসে ফুসলানি দেয় যে, কোনো এক আশ্চর্য সরোবরে পৃথিবীর সবচেয়ে সরলতম মাছেরা এখনো তাদের জল-জীবনের প্রথম বঁড়শিতে হৃদয়বিদ্ধ করবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছে, আর জীবনে কখনো কয়েকটা পুঁটি ছাড়া অন্য কিছু জল থেকে টেনে তোলার সৌভাগ্য যদি আপনার না হয়ে থাকে, তাহলে হঠাৎ একদিন তেলেনাপোতা আপনিও আবিষ্কার করতে পারেন।

তেলেনাপোতা আবিষ্কার করতে হলে একদিন বিকেলবেলার পড়ন্ত রোদে জিনিসে-মানুষে ঠাসাঠাসি একটা বাসে গিয়ে আপনাকে উঠতে হবে, তারপর রাস্তার ঝাঁকানির সঙ্গে মানুষের গুঁতো খেতে খেতে ভাদ্রের গরমে ঘামে ধুলোয় চটচটে শরীর নিয়ে ঘণ্টা দুয়েক বাদে রাস্তার মাঝখানে নেমে পড়তে হবে আচমকা। সামনে নীচু একটা জলার মতো জায়গার উপর দিয়ে ঘর্ঘর শব্দে বাসটি চলে গিয়ে ওধারে পথের বাঁকে অদৃশ্য হবার পর দেখবেন, সূর্য এখনো না ডুবলেও চারিদিক ঘন জঙ্গলে অন্ধকার হয়ে এসেছে। কোনো দিকে চেয়ে জনমানব দেখতে পাবেন না। মনে হবে পাখিরাও যেন সভয়ে সে জায়গা পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছে। একটা স্যাঁতসেঁতে ভিজে ভাপসা আবহাওয়া টের পাবেন। মনে হবে নীচের জলা থেকে একটু ক্রুর কুণ্ডলিত জলীয় অভিশাপ ধীরে ধীরে অদৃশ্য ফণা তুলে উঠে আসছে।

বড়ো রাস্তা থেকে নেমে সেই ভিজে জলার কাছেই গিয়ে দাঁড়াতে হবে আপনাকে। সামনে ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে মনে হবে একটা কাদাজলের নালা কে যেন কেটে রেখেছে। সে নালার মতো রেখাও কিছু দূরে গিয়ে দু-ধারে বাঁশঝাড় আর বড়ো বড়ো ঝাঁকড়া গাছের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে।

তেলেনাপোতা আবিষ্কারের জন্যে আরো দুজন বন্ধু ও সঙ্গী আপনার সঙ্গে থাকা উচিত। তারা হয়তো আপনার মতো ঠিক মৎস্যলুব্ধ নয়, তবু এ অভিযানে তারা এসেছে, কে জানে আর কোন অভিসন্ধিতে।

তিনজনে মিলে তারপর সামনে নালার দিকে উৎসুকভাবে চেয়ে থাকবেন। মাঝে মাঝে পা ঠুকে মশাদের ঘনিষ্ঠতায় বাধা দেবার চেষ্টা করবেন এবং সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে এ ওর মুখের দিকে চাইবেন।

খানিক বাদে পরস্পরের মুখও আর ঘনায়মান অন্ধকারে ভালো করে দেখা যাবে না। মশাদের ঐকতান আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠবে। আবার বড়ো রাস্তায় উঠে ফিরতি কোনো বাসের চেষ্টা করবেন কিনা যখন ভাবছেন, তখন হঠাৎ সেই কাদাজলের নালা যেখানে জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে, সেখান থেকে অপরূপ একটি শ্রুতিবিস্ময়কর আওয়াজ পাবেন। মনে হবে বোবা জঙ্গল থেকে কে যেন অমানুষিক এক কান্না নিংড়ে নিংড়ে বার করছে।

সে শব্দে আপনারা কিন্তু প্রতীক্ষায় চঞ্চল হয়ে উঠবেন। প্রতীক্ষাও আপনাদের ব্যর্থ হবে না। আবছা অন্ধকারে প্রথমে একটি ক্ষীণ আলো দুলতে দেখা যাবে ও তারপর একটি গোরুর গাড়ি জঙ্গলের ভিতর থেকে নালা দিয়ে ধীর মন্থর দোদুল্যমান গতিতে বেরিয়ে আসবে।

যেমন গাড়িটি তেমনি গোরুগুলি। মনে হবে পাতালের কোনো বামনের দেশ থেকে গোরুর গাড়ির এই ক্ষুদ্র সংক্ষিপ্ত সংস্করণটি বেরিয়ে এসেছে।

বৃথা বাক্য ব্যয় না করে সেই গোরুর গাড়ির ছইয়ের ভিতর তিনজনে কোনোরকমে প্রবেশ করবেন ও তিন জোড়া হাত ও পা এবং তিনটি মাথা নিয়ে স্বল্পতম স্থানে সর্বাধিক বস্তু কীভাবে সংস্থাপিত করা যায় সে সমস্যার মীমাংসা করবেন।

গোরুর গাড়িটি তারপর যে-পথে এসেছিল, সেই পথে অথবা নালায় ফিরে চলতে শুরু করবে। বিস্মিত হয়ে দেখবেন, ঘন অন্ধকার অরণ্য যেন সংকীর্ণ একটু সুড়ঙ্গের মতো পথ সামনে একটু একটু করে উন্মোচন করে দিচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে মনে হবে কালো অন্ধকারের দেয়াল বুঝি অভেদ্য, কিন্তু তবু গোরুর গাড়িটি অবিচলিতভাবে ধীর মন্থর গতিতে এগিয়ে যাবে পায়ে পায়ে পথ যেন ছড়িয়ে ছড়িয়ে।

কিছুক্ষণ হাত পা ও মাথার যথোচিত সংস্থান বিপর্যস্ত হবার সম্ভাবনায় বেশ একটু অস্বস্তি বোধ করবেন। বন্ধুদের সঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে অনিচ্ছাকৃত সংঘর্ষ বাধবে, তারপর ধীরে ধীরে বুঝতে পারবেন চারিধারের গাঢ় অন্ধকারে চেতনার শেষ অন্তরীপটিও নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছে। মনে হবে পরিচিত পৃথিবীকে দূরে কোথাও ফেলে এসেছেন। অনুভূতিহীন কুয়াশাময় এক জগৎ শুধু আপনার চারিধারে। সময় সেখানে স্তব্ধ স্রোতহীন।

সময় স্তব্ধ, সুতরাং এ আচ্ছন্নতা কতক্ষণ ধরে যে থাকবে বুঝতে পারবেন না। হঠাৎ এক সময় উৎকট এক বাদ্য-ঝঞ্ঝনায় জেগে উঠে দেখবেন, ছইয়ের ভিতর দিয়ে আকাশের তারা দেখা যাচ্ছে এবং গাড়ির গাড়োয়ান থেকে থেকে সোৎসাহে একটি ক্যানেস্তারা বাজাচ্ছে।

কৌতূহলী হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করলে গাড়োয়ান নিতান্ত নির্বিকারভাবে আপনাকে জানাবে, আজ্ঞে, ওই শালার বাঘ খেদাতে।

ব্যাপারটা ভালো করে হৃদয়ঙ্গম করার পর, মাত্র ক্যানেস্তারা-নিনাদে ব্যাঘ্র-বিতাড়ন সম্ভব কিনা, কম্পিত কণ্ঠে এ প্রশ্ন আপনি উত্থাপন করবার আগেই গাড়োয়ান আপনাকে আশ্বস্ত করবার জন্যে জানাবে যে, বাঘ মানে চিতাবাঘ মাত্র, এবং নিতান্ত ক্ষুধার্ত না হলে এই ক্যানেস্তারা-নিনাদই তাকে তফাত রাখবার পক্ষে যথেষ্ট।

মহানগরী থেকে মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে ব্যাঘ্রসংকুল এরকম স্থানের অস্তিত্ব কী করে সম্ভব, আপনি যতক্ষণ চিন্তা করবেন ততক্ষণে গোরুর গাড়ি বিশাল একটি মাঠ পার হয়ে যাবে। আকাশে তখন কৃষ্ণপক্ষের বিলম্বিত ক্ষয়িত চাঁদ বোধ হয় উঠে এসেছে। তারই স্তিমিত আলোয় আবছা বিশাল মৌন সব প্রহরী গাড়ির দু-পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে সরে যাবে। প্রাচীন অট্টালিকার সেসব ধ্বংসাবশেষ— কোথাও একটা থাম, কোথাও একটা দেউড়ির খিলান, কোথাও কোনো মন্দিরের ভগ্নাংশ, মহাকালের কাছে সাক্ষ্য দেবার ব্যর্থ আশায় দাঁড়িয়ে আছে।

ওই অবস্থায় যতখানি সম্ভব মাথা তুলে বসে কেমন একটা শিহরণ সারা শরীরে অনুভব করবেন। জীবন্ত পৃথিবী ছাড়িয়ে অতীতের কোনো কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন স্মৃতিলোকে এসে পড়েছেন বলে ধারণা হবে।

রাত তখন কত আপনি জানেন না, কিন্তু মনে হবে এখানে রাত যেন কখনও ফুরোয় না। নিবিড় অনাদি অনন্ত স্তব্ধতায় সব কিছু নিমগ্ন হয়ে আছে; জাদুঘরের নানা প্রাণীদেহ আরকের মধ্যে যেমন থাকে।

দু-তিনবার মোড় ঘুরে গোরুর গাড়ি এবার এক জায়গায় এসে থামবে। হাত-পাগুলো নানাস্থান থেকে কোনোরকমে কুড়িয়ে সংগ্রহ করে কাঠের পুতুলের মতো আড়ষ্টভাবে আপনারা একে একে নামবেন। একটা কটু গন্ধ অনেকক্ষণ ধরেই আপনাদের অভ্যর্থনা করছে। বুঝতে পারবেন সেটা পুকুরের পানা-পচা গন্ধ। অর্ধস্ফুট চাঁদের আলোয় তেমন একটি নাতিক্ষুদ্র পুকুর সামনেই চোখে পড়বে। তারই পাশে বেশ বিশালায়তন একটি জীর্ণ অট্টালিকা ভাঙা ছাদ, ধসে-পড়া দেয়াল ও চক্ষুহীন কোটরের মতো পাল্লাহীন জানালা নিয়ে নবোদিত চাঁদের বিরুদ্ধে দুর্গ-প্রাকারের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

এই ধ্বংসাবশেষেরই একটি অপেক্ষাকৃত বাসযোগ্য ঘরে আপনাদের থাকার ব্যবস্থা করে নিতে হবে। কোথা থেকে গাড়োয়ান একটি ভাঙা লণ্ঠন নিয়ে এসে ঘরে বসিয়ে দেবে। সেই সঙ্গে এক এক কলশি জল। ঘরে ঢুকে বুঝতে পারবেন বহু যুগ পরে মনুষ্যজাতির প্রতিনিধি হিসাবে আপনারাই সেখানে প্রথম পদার্পণ করছেন। ঘরের ঝুল, জঞ্জাল ও ধুলো হয়তো কেউ আগে কখনও পরিষ্কার করার ব্যর্থ চেষ্টা করে গিয়েছে। ঘরের অধিষ্ঠাত্রী আত্মা যে তাতে ক্ষুব্ধ, একটি অস্পষ্ট ভাপসা গন্ধে তার প্রমাণ পাবেন। সামান্য চলাফেরায় ছাদ ও দেয়াল থেকে জীর্ণ পলস্তারা সেই রুষ্ট আত্মার অভিশাপের মতো থেকে থেকে আপনাদের উপর বর্ষিত হবে। দু-তিনটি চামচিকা ঘরের অধিকার নিয়ে আপনাদের সঙ্গে সমস্ত রাত বিবাদ করবে।

তেলেনাপোতা আবিষ্কারের জন্যে আপনার দুটি বন্ধুর একজন পানরসিক ও অপরজনের নিদ্রাবিলাসী কুম্ভকর্ণের দোসর হওয়া দরকার। ঘরে পৌঁছেই, মেঝের উপর কোনোরকমে শতরঞ্চির আবরণ পড়তে-না-পড়তে একজন তার উপর নিজেকে বিস্তৃত করে নাসিকাধ্বনি করতে করবেন, অপরজন পানপাত্রে নিজেকে নিমজ্জিত করে দেবেন।

রাত বাড়বে। ভাঙা লণ্ঠনের কাচের চিমনি ক্রমশ গাঢ়ভাবে কালিমালিপ্ত হয়ে ধীরে ধীরে অন্ধ হয়ে যাবে। কোনো রহস্যময় বেতার-সংকেতে খবর পেয়ে সে অঞ্চলের সমস্ত সমর্থ সাবালক মশা নবাগতদের অভিনন্দন জানাবে ও তাদের সঙ্গে শোণিত-সম্বন্ধ স্থাপন করতে আসবে। আপনি বিচক্ষণ হলে দেয়ালে ও গায়ে বসবার বিশিষ্ট ভঙ্গি দেখে বুঝবেন, তারা মশাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো কুলীন, ম্যালেরিয়া দেবীর অদ্বিতীয় বাহন অ্যানোফিলিস। আপনার দুই বন্ধু তখন দুই কারণে অচেতন। ধীরে ধীরে তাই শয্যা পরিত্যাগ করে উঠে দাঁড়াবেন, তারপর গুমোট গরম থেকে একটু পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে টর্চটি হাতে নিয়ে ভগ্নপ্রায় সিঁড়ি দিয়ে উপরের ছাদে উঠবার চেষ্টা করবেন।

প্রতি মুহূর্তে কোথাও ইট বা টালি খসে পড়ে ভূপতিত হওয়ার বিপদ আপনাকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করবে, তবু কোনো দুর্বার আকর্ষণে সমস্ত অগ্রাহ্য করে আপনি উপরে না উঠে পারবেন না।

ছাদে গিয়ে দেখবেন, অধিকাংশ জায়গাতে অলিসা ভেঙে ধুলিসাৎ হয়েছে, ফাটলে ফাটলে অরণ্যের পঞ্চম বাহিনী ষড়যন্ত্রের শিকড় চালিয়ে ভিতর থেকে এ অট্টালিকার ধ্বংসের কাজ অনেকখানি এগিয়ে রেখেছে; তবু কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ চাঁদের আলোয় সমস্ত কেমন অপরূপ মোহময় মনে হবে। মনে হবে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকলে এই মৃত্যু সুসুপ্তি মগ্ন মায়াপুরীর কোনো গোপন প্রকোষ্ঠে বন্দিনী রাজকুমারী সোনার কাঠি

রূপার কাঠি পাশে নিয়ে যুগান্তের গাঢ় তন্দ্রায় অচেতন, তা যেন আপনি টের পাবেন। সেই মুহূর্তে অদূরে সংকীর্ণ রাস্তার ওপারে একটি ভগ্নস্তূপ বলে যা মনে হয়েছিল তারই একটি জানালায় একটি আলোর ক্ষীণ রেখা আপনার চোখে পড়বে। সেই আলোর রেখা আড়াল করে একটি রহস্যময় ছায়ামূর্তি সেখানে এসে দাঁড়াবে। গভীর নিশীথরাত্রে কে যে এই বাতায়নবর্তিনী, কেন যে তার চোখে ঘুম নেই, আপনি ভাববার চেষ্টা করবেন, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারবেন না। খানিকবাদে মনে হবে, সবই বুঝি আপনার চোখের ভ্রম। বাতায়ন থেকে সে ছায়া সরে গিয়েছে, আলোর ক্ষীণ রেখা গিয়েছে মুছে। মনে হবে এই ধ্বংসপুরীর অতল নিদ্রা থেকে একটি স্বপ্নের বুদবুদ ক্ষণিকের জন্য জীবনের জগতে ভেসে উঠে আবার মিলিয়ে গিয়েছে।

আপনি আবার সন্তর্পণে নীচে নেমে আসবেন এবং কখন এক সময়ে দুই বন্ধুর পাশে একটু জায়গা করে ঘুমিয়ে পড়বেন জানতে পারবেন না।

যখন জেগে উঠবেন তখন অবাক হয়ে দেখবেন, এই রাত্রির দেশেও সকাল হয়, পাখির কলরবে চারিদিক ভরে যায়।

আপনার আসল উদ্দেশ্য আপনি নিশ্চয় বিস্মৃত হবেন না। এক সময়ে ষোড়শোপচার আয়োজন নিয়ে মৎস্য-আরাধনার জন্যে শ্যাওলা ঢাকা ভাঙা ঘাটের একটি ধারে বসে গুঁড়ি-পানায় সবুজ জলের মধ্যে যথোচিত নৈবেদ্য সমেত বঁড়শি নামিয়ে দেবেন।

বেলা বাড়বে। ওপারের ঝুঁকে-পড়া একটা বাঁশের ডগা থেকে একটা মাছরাঙা পাখি ক্ষণে ক্ষণে আপনাকে যেন উপহাস করবার জন্যেই বাতাসে রঙের ঝিলিক বুলিয়ে পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে ও সার্থক শিকারের উল্লাসে আবার বাঁশের ডগায় ফিরে গিয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় আপনাকে বিদ্রূপ করবে। আপনাকে সন্ত্রস্ত করে একটা মোটা লম্বা সাপ ভাঙা ঘাটের কোনো ফাটল থেকে বেরিয়ে ধীর অঞ্চল গতিতে পুকুরটা সাঁতরে পার হয়ে ওধারে গিয়ে উঠবে, দুটো ফড়িং পাল্লা দিয়ে পাতলা কাচের মতো পাখা নেড়ে আপনার ফাতনাটার উপর বসবার চেষ্টা করবে ও থেকে থেকে উদাস, ঘুঘুর ডাকে আপনি আনমনা হয়ে যাবেন।

তারপর হঠাৎ জলের শব্দে আপনার চমক ভাঙবে। নিথর জলে ঢেউ উঠেছে, আপনার ছিপের ফাতনা মৃদুমন্দভাবে তাতে দুলছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখবেন, একটি মেয়ে পিতলের ঝকঝকে কলশিতে পুকুরের পানা ঢেউ দিয়ে সরিয়ে জল ভরছে। মেয়েটির চোখে কৌতূহল আছে কিন্তু গতিবিধিতে সলজ্জ আড়ষ্টতা নেই। সোজাসুজি সে আপনার দিকে তাকাবে, আপনার ফাতনা লক্ষ করবে, তারপর আবার মুখ ফিরিয়ে কলশিটা কোমরে তুলে নেবে।

মেয়েটি কোন বয়সের আপনি বুঝতে পারবেন না। তার মুখের শান্ত করুণ গাম্ভীর্য দেখে মনে হবে জীবনের সুদীর্ঘ নির্মম পথ সে পার হয়ে এসেছে, তার ক্ষীণ দীর্ঘ অপুষ্ট শরীর দেখলে মনে হবে কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে উত্তীর্ণ হওয়া তার যেন স্থগিত হয়ে আছে।

কলশি নিয়ে চলে যেতে যেতে ফিরে তাকিয়ে মেয়েটি হঠাৎ বলবে, 'বসে আছেন কেন? টান দিন।'

সে কণ্ঠ এমন শান্ত মধুর ও গম্ভীর যে, এভাবে আপনা থেকে অপরিচিতের সঙ্গে কথা বলা আপনার মোটেই অস্বাভাবিক ঠেকবে না। শুধু আকস্মিক চমকের দরুন বিহ্বল হয়ে ছিপে টান দিতে আপনি ভুলে যাবেন। তারপর ডুবে যাওয়া ফাতনা আবার ভেসে উঠবার পর ছিপ তুলে দেখবেন বঁড়শিতে টোপ আর নেই। একটু অপ্রস্তুতভাবে মেয়েটির দিকে আপনাকে এবার তাকাতেই হবে। সেও মুখ ফিরিয়ে শান্ত ধীর

পদে ঘাট ছেড়ে চলে যাবে, কিন্তু মনে হবে মুখ ফেরাবার চকিত মুহূর্তে একটু যেন দীপ্ত হাসির আভাস সেই শান্ত করুণ মুখে খেলে গিয়েছে।

পুকুরের ঘাটের নির্জনতা আর ভঙ্গ হবে না তারপর। ওপারের মাছরাঙাটা আপনাকে লজ্জা দেবার নিষ্ফল চেষ্টা ত্যাগ করে অনেক আগেই উড়ে গিয়েছে। মাছেরা আপনার শক্তি -সামর্থ্য সম্বন্ধে গভীর অবজ্ঞা নিয়েই বোধ হয় আর দ্বিতীয়বার প্রতিযোগিতায় নামতে চাইবে না। খানিক আগের ঘটনাটা আপনার কাছে অবাস্তব বলে মনে হবে। এই জনহীন ঘুমের দেশে সত্যি ওরকম মেয়ে কোথাও আছে আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না।

এক সময়ে হতাশ হয়ে আপনাকে সাজসরঞ্জাম নিয়ে উঠে পড়তে হবে। ফিরে গিয়ে হয়তো দেখবেন, আপনার মৎস্যশিকার নৈপুণ্যের বৃত্তান্ত ইতিমধ্যে কেমন করে আপনার বন্ধুদের কর্ণগোচর হয়েছে। তাদের পরিহাসে ক্ষুণ্ণ হয়ে এ কাহিনি কোথায় তারা শুনল, জিজ্ঞাসা করে হয়তো আপনার পানরসিক বন্ধুর কাছে শুনবেন, 'কে আবার বলবে! এই মাত্র যামিনী নিজের চোখে দেখে এল যে!'

আপনাকে কৌতূহলী হয়ে যামিনীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করতেই হবে। তখন হয়তো জানতে পারবেন যে পুকুর ঘাটের সেই অবাস্তব করুণনয়না মেয়েটি আপনার পানরসিক বন্ধুটিরই জ্ঞাতিস্থানীয়া। সেইসঙ্গে আরো শুনবেন যে, দ্বিপ্রাহরিক আহারের ব্যবস্থাটা সেদিনকার মতো তাদের ওখানেই হয়েছে।

যে ভগ্নস্তূপে গত রাত্রে ক্ষণিকের জন্যে একটি ছায়ামূর্তি আপনার বিস্ময় উৎপাদন করছিল, দিনের রূঢ় আলোয় তার শ্রীহীন জীর্ণতা আপনাকে অত্যন্ত পীড়িত করবে। রাত্রির মায়াবরণ সরে গিয়ে তার নগ্ন ধ্বংসমূর্তি এত কুৎসিত হয়ে উঠতে পারে আপনি ভাবতে পারেননি।

এইটিই যামিনীদের বাড়ি জেনে আপনি অবাক হবেন। এই বাড়িরই একটি ঘরে আপনাদের হয়তো আহারের ব্যবস্থা হয়েছে। আয়োজন যৎসামান্য, হয়তো যামিনী নিজেই পরিবেশন করছে। মেয়েটির অনাবশ্যক লজ্জা বা আড়ষ্টতা যে নেই, আপনি আগেই লক্ষ করেছেন, শুধু কাছ থেকে তার মুখের করুণ গাম্ভীর্য আরো বেশি করে আপনার চোখে পড়বে। এই পরিত্যক্ত বিস্মৃত জনহীন লোকালয়ের সমস্ত মৌন-বেদনা যেন তার মুখে ছায়া ফেলেছে। সব কিছু দেখেও তার দৃষ্টি যেন গভীর এক ক্লান্তির অতলতায় নিমগ্ন। একদিন যেন সে এই ধ্বংসস্তূপেই ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাবে।

আপনাদের পরিবেশন করতে করতে দু-চারবার তাকে তবু চঞ্চল ও উদ্‌বিগ্ন হয়ে উঠতে আপনি দেখবেন। উপরতলার কোনো ঘর থেকে ক্ষীণ একটা কণ্ঠ যেন কাকে ডাকছে। যামিনী ব্যস্ত হয়ে বাইরে চলে যাবে। প্রত্যেকবার ফিরে আসবার সঙ্গে তার মুখে বেদনার ছায়া যেন আরো গভীর হয়ে উঠছে মনে হবে, সেইসঙ্গে কেমন একটা অসহায় অস্থিরতা তার চোখে।

খাওয়া শেষ করে আপনারা তখন একটু বিশ্রাম করতে পারেন। অত্যন্ত দ্বিধাভরে কয়েকবার ইতস্তত করে যে যেন শেষে মরিয়া হয়ে দরজা থেকে ডাকবে, 'একটু এখানে শুনে যাও মণিদা।'

মণিদা আপনার সেই পানরসিক বন্ধু। তিনি দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াবার পর যে আলাপটুকু হবে তা এমন নিম্নস্বরে নয় যে, আপনারা শুনতে পাবেন না।

শুনবেন, যামিনী অত্যন্ত কাতর স্বরে বিপন্নভাবে বলছে, 'মা তো কিছুতেই শুনছেন না। তোমাদের আসার খবর পাওয়া অবধি কী যে অস্থির হয়ে উঠেছেন কী বলব!'

মণি একটু বিরক্তির স্বরে বলবে, 'ওঃ সেই খেয়াল এখনো! নিরঞ্জন এসেছে, ভাবছেন বুঝি?'

'হ্যাঁ, কেবলই বলছেন, ''সে নিশ্চয় এসেছে। শুধু লজ্জায় আমার সঙ্গে দেখা করতে পারছে না, আমি জানি। তাকে ডেকে দে। কেন তুই আমার কাছে লুকোচ্ছিস?'' কী যে আমি করব ভেবে পাচ্ছি না। অন্ধ হয়ে যাবার পর থেকে আজকাল এত অধৈর্যতা বেড়েছে যে, কোনো কথা বোঝালে বোঝেন না, রেগে মাথা খুঁড়ে এমন কাণ্ড করেন যে, তখন ওঁর প্রাণ বাঁচানো দায় হয়ে ওঠে!'

'হুঁ, এ তো বড়ো মুশকিল দেখছি। চোখ থাকলেও না হয় দেখিয়ে দিতাম যে, যারা এসেছে তাদের কেউ নিরঞ্জন নয়।'

উপর থেকে দুর্বল অথচ তীক্ষ্ণ ক্রুদ্ধ কণ্ঠের ডাকটা এবার আপনারাও শুনতে পাবেন। যামিনী এবার কাতর কণ্ঠে অনুনয় করবে, 'তুমি একবারটি চলো মণিদা, যদি একটু বুঝিয়ে-শুঝিয়ে ঠান্ডা করতে পারো।'

'আচ্ছা, তুই যা, আমি আসছি।' মণি এবার ঘরে ঢুকে নিজের মনেই বলবে, 'এ এক আচ্ছা জ্বালা হয়েছে যা হোক। বুড়ির হাত-পা পড়ে গেছে, চোখ নেই, তবু বুড়ি পণ করে বসে আছে কিছুতেই মরবে না।'

ব্যাপারটা কী এবার আপনারা হয়তো জানতে চাইবেন। মণি বিরক্তির স্বরে বলবে, 'ব্যাপার আর কী! নিরঞ্জন বলে ওঁর দূর-সম্পর্কের এক বোনপোর সঙ্গে ছেলেবেলায় যামিনীর সম্বন্ধ উনি ঠিক করেছিলেন। বছর চারেক আগেও সে ছোকরা এসে ওঁকে বলে গিয়েছিল বিদেশের চাকরি থেকে ফিরে ওঁর মেয়েকে সে বিয়ে করবে। সেই থেকে বুড়ি এই অজগর-পুরীর ভেতর বসে সেই আশায় দিন গুনছে।'

আপনি নিজে থেকে এবার জিজ্ঞাসা না করে পারবেন না, 'নিরঞ্জন কি এখনো বিদেশ থেকে ফেরেনি?'

'আরে, সে বিদেশে গিয়েছিল কবে যে ফিরবে! নেহাত বুড়ি নাছোড়বান্দা বলে তাকে এই ধাপ্পা দিয়ে গিয়েছিল। এমন ঘুঁটে-কুড়ুনির মেয়েকে উদ্ধার করতে তার দায় পড়েছে। সে কবে বিয়ে-থা করে দিব্যি সংসার করছে। কিন্তু সে কথা ওঁকে বলে কে? বললে বিশ্বাসই করবেন না, আর বিশ্বাস যদি করেন তা হলে এখুনি তো দম ছুটে অক্কা! কে মিছিমিছি পাতকের ভাগী হবে?'

'যামিনী নিরঞ্জনের কথা জানে?'

'তা আর জানে না! কিন্তু মার কাছে বলবার উপায় তো নেই। যাই, কর্মভোগ সেরে আসি।' বলে মণি সিঁড়ির দিকে পা বাড়াবে।

সেই মুহূর্তে নিজের অজ্ঞাতসারেই আপনাকে হয়তো উঠে দাঁড়াতে হবে। হঠাৎ হয়তো বলে ফেলবেন, 'চলো আমিও যাব।'

'তুমি যাবে'! মণি ফিরে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে নিশ্চয় আপনার দিকে তাকাবে।

'হ্যাঁ। কোনো আপত্তি আছে গেলে?'

'না আপত্তি কীসের!' বলে বেশ বিমূঢ়ভাবেই মণি আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

সংকীর্ণ অন্ধকার ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে যে ঘরটিতে আপনি পৌঁছোবেন, মনে হবে উপরে নয়, মাটির তলার সুড়ঙ্গেই বুঝি তার স্থান। একটি মাত্র জানালা, তাও বন্ধ, বাইরের আলো থেকে এসে প্রথমে আপনার চোখে সবই ঝাপসা ঠেকবে, তারপর টের পাবেন, প্রায় ঘরজোড়া একটি ভাঙা তক্তাপোশে ছিন্ন-কন্থা-জড়িত একটি শীর্ণ কঙ্কালসার মূর্তি শুয়ে আছে। তক্তাপোশের একপাশে যামিনী পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে।

আপনাদের পদশব্দ শুনে সেই কঙ্কালের মধ্যেও যেন চাঞ্চল্য দেখা দেবে, 'কে, নিরঞ্জন এলি? অভাগী মাসিকে এতদিনে মনে পড়ল বাবা? তুই আসবি বলে প্রাণটা যে আমার কণ্ঠায় এসে আটকে আছে। কিছুতেই যে নিশ্চিন্তি হয়ে মরতে পারছিলাম না। এবার তো আর অমন করে পালাবি না?'

মণি কী যেন বলতে যাবে, তাকে বাধা দিয়ে আপনি অকস্মাৎ বলবেন, 'না মাসিমা, আর পালাব না।'

মুখ না তুলেও মণির বিমূঢ়তা ও আর একটি স্থানুর মতো মেয়ের মুখে স্তম্ভিত বিস্ময় আপনি যেন অনুভব করতে পারবেন। কিন্তু কোনোদিকে তাকাবার অবসর আপনার থাকবে না। দৃষ্টিহীন দুটি চোখের কোটরের দিকে আপনি তখন নিস্পন্দ হয়ে রুদ্ধ নিশ্বাসে চেয়ে আছেন। মনে হবে সেই শূন্য কোটরের ভিতর থেকে অন্ধকারের দুটি কালো শিখা বেরিয়ে এসে যেন আপনার সর্বাঙ্গ লেহন করে পরীক্ষা করছে। কটি স্তব্ধ মুহূর্ত ধীরে ধীরে সময়ের সাগরে শিশির বিন্দুর মতো ঝরে পড়ছে, আপনি অনুভব করবেন। তারপর শুনতে পাবেন, 'আমি জানতাম, তুই না এসে পারবি না বাবা। তাই তো এমন করে এই প্রেতপুরী পাহারা দিয়ে দিন গুনছি।'

বৃদ্ধা কথা বলে হাঁফাবেন, চকিতে একবার যামিনীর উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে আপনার মনে হবে বাইরের কঠিন মুখোশের অন্তরালে তার মধ্যেও কোথায় যেন কী ধীরে ধীরে গলে যাচ্ছে, ভাগ্য ও জীবনের বিরুদ্ধে, গভীর হতাশার উপাদানে তৈরি এক সুদৃঢ় শপথের ভিত্তি আলগা হয়ে যেতে আর বুঝি দেরি নেই।

বৃদ্ধা আবার বলবেন, 'যামিনীকে নিয়ে তুই সুখী হবি বাবা। আমার পেটে হয়েছে বলে বলছি না, এমন হয় না। শোকে-তাপে বুড়ো হয়ে মাথার ঠিক নেই, রাতদিন খিটখিট করে মেয়েটাকে যে কত যন্ত্রণা দিই, তা কি আমি জানি না। তবু মুখে ওর রা নেই। এই শ্মশানের দেশ, দশটা বাড়ি খুঁজলে একটা পুরুষ মেলে না। আমার মতো ঘাটের মড়ারা শুধু ভাঙা ইট আঁকড়ে এখানে-সেখানে ধুঁকছে, এর মধ্যে একাধারে মেয়ে পুরুষ হয়ে ও কী না করছে!'

একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও চোখ তুলে একটিবার তাকাতে আপনার সাহস হবে না। আপনার নিজের চোখের জল বুঝি আর গোপন রাখা যাবে না।

বৃদ্ধা ছোটো একটি নিশ্বাস ফেলে বলবেন, 'যামিনীকে তুই নিবি তো বাবা? তোর শেষ কথা না পেলে আমি মরেও শান্তি পাব না।'

ধরা গলায় আপনি তখন শুধু বলতে পারবেন, 'আমি তোমায় কথা দিচ্ছি মাসিমা। আমার কথার নড়চড় হবে না।'

তারপর বিকালে আবার গোরুর গাড়ি দরজায় এসে দাঁড়াবে। আপনারা তিনজনে একে একে তাতে উঠবেন। যাবার মুহূর্তে গাড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়ে আপনার দিকে সেই করুণ দুটি চোখ তুলে যামিনী শুধু বলবে, 'আপনার ছিপটিপ যে পড়ে রইল!'

আপনি হেসে বলবেন, 'থাক-না। এবারে পারিনি বলে তেলেনাপোতার মাছ কি বারবার ফাঁকি দিতে পারবে?'

যামিনী মুখ ফিরিয়ে নেবে না। ঠোঁট থেকে নয়, মনে হবে, তার চোখের ভিতর থেকে মধুর একটি সকৃতজ্ঞ হাসি শরতের শুভ্র মেঘের মতো আপনার হৃদয়ের দিগন্ত স্নিগ্ধ করে ভেসে যাচ্ছে।

গাড়ি চলবে। কবে একশো না দেড়শো বছর আগে প্রথম ম্যালেরিয়ার মড়কের এক দুর্বার বন্যা তেলেনাপোতাকে চলমান জীবন্ত জগতের এই বিস্মৃতিবিলীন প্রান্তে ভাসিয়ে এনে ফেলে রেখে গিয়েছিল—আপনার বন্ধুরা হয়তো সেই আলোচনা করবেন। যেসব কথা ভালো করে আপনার কানে যাবে না। গাড়ির সংকীর্ণতা আর আপনাকে পীড়িত করবে না, তার চাকার একঘেয়ে কাঁদুনি আর আপনার কাছে কর্কশ লাগবে না। আপনি শুধু নিজের হৃৎস্পন্দনে একটি কথাই বারবার ধ্বনিত হচ্ছে শুনবেন, 'ফিরে আসব, ফিরে আসব।'

মহানগরের জনাকীর্ণ আলোকোজ্জ্বল রাজপথে যখন এসে পৌঁছোবেন তখনো আপনার মনে তেলেনাপোতার স্মৃতি সুদূর অথচ অতি অন্তরঙ্গ একটি তারার মতো উজ্জ্বল হয়ে আছে। ছোটোখাটো বাধা-বিড়ম্বিত কটি দিন কেটে যাবে। মনের আকাশে একটু করে কুয়াশা জমেছে কিনা আপনি টের পাবেন না। তারপর যেদিন সমস্ত বাধা অপসারিত করে তেলেনাপোতায় ফিরে যাবার জন্যে আপনি প্রস্তুত হবেন, সেদিন হঠাৎ মাথার যন্ত্রণায় ও কম্প দেওয়া শীতে লেপ-তোশক মুড়ি দিয়ে আপনাকে শুতে হবে। থার্মোমিটারের পারা জানাবে এক শত পাঁচ ডিগ্রি, ডাক্তার এসে বলবে, 'ম্যালেরিয়াটি কোথা থেকে বাগালেন?' আপনি শুনতে শুনতে জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে যাবেন।

বহুদিন বাদে অত্যন্ত দুর্বল শরীর নিয়ে যখন বাইরের আলো-হাওয়ায় কম্পিত পদে এসে বসবেন, তখন দেখবেন নিজের অজ্ঞাতসারে দেহ ও মনের অনেক ধোয়া-মোছা ইতিমধ্যে হয়ে গিয়েছে। অস্ত যাওয়া তারার মতো তেলেনাপোতার স্মৃতি আপনার কাছে ঝাপসা একটা স্বপ্ন বলে মনে হবে। মনে হবে তেলেনাপোতা বলে কোথায় কিছু সত্যি নেই। গম্ভীর কঠিন যার মুখ আর দৃষ্টি যার সুদূর ও করুণ, ধ্বংসপুরীর ছায়ার মতো সেই মেয়েটি হয়তো আপনার কোনো দুর্বল মুহূর্তের অবাস্তব কুয়াশার কল্পনা মাত্র।

একবার ক্ষণিকের জন্যে আবিষ্কৃত হয়ে তেলেনাপোতা আবার চিরন্তন রাত্রির অতলতায় নিমগ্ন হয়ে যাবে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮) : বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি, ঔপন্যাসিক ও ছোটোগল্পকার। পিতার রেলের চাকরির সুবাদে ভারতের নানান জায়গায় ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ পেয়েছিলেন, পরবর্তীকালে সাহিত্যজীবনে সেই অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটে। তীক্ষ্ণধার ভাষা আর তির্যক ভঙ্গি তাঁর লেখনীর বৈশিষ্ট্য। হাস্যরসের মধ্য দিয়ে শ্লেষের তির বা সামাজিক-রাজনৈতিক কটাক্ষ ছিল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গি। তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ : *বেনামী বন্দর, পুতুল ও প্রতিমা, মৃত্তিকা, পঞ্চশর, অফুরন্ত, জলপায়রা,ধূলিধূসর, মহানগর, সপ্তপদী, নানা রঙে বোনা। শুধু কেরানী, মোট বারো, পুন্নাম, শৃঙ্খল, বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে* প্রভৃতি তাঁর লেখা অবিস্মরণীয় ছোটোগল্প। তাঁর লেখা বিজ্ঞান-নির্ভর রচনাগুলির মধ্যে রয়েছে *পিঁপড়ে পুরাণ, মঙ্গলবৈরী, পৃথিবীর শত্রু, করাল কীট, ময়দানবের দ্বীপ* প্রভৃতি। ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে 'প্রবাসী' পত্রিকায় তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প 'শুধু কেরাণী'। তিনি 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'বাংলার কথা', 'বঙ্গবাণী' প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন, লিখেছেন সুধীরচন্দ্র সরকারের 'মৌচাক' পত্রিকায়। ঘনাদা, মামাবাবু, ভূত-শিকারি মেজকর্তা এবং গোয়েন্দা-কবি পরাশর বর্মা প্রভৃতি তাঁর সৃষ্ট কয়েকটি বিখ্যাত চরিত্র।

ডাকাতের মা

সতীনাথ ভাদুড়ী

আগে সে ছিল ডাকাতের বউ। সৌখীর বাপ মরে যাবার পর থেকে তার পরিচয় ডাকাতের মা বলে। ...ডাকাতের মায়ের ঘুম কি পাতলা না হলে চলে! রাতবিরেতে কখন দরজায় টোকা পড়বে তার কি ঠিক আছে! টকটক করে দু-টোকার শব্দ থেমে থেমে তিনবার হলে বুঝতে হবে দলের লোক টাকা দিতে এসেছে। তিনবারের পর আরও একবার হলে বুঝতে হবে যে, সৌখী নিজে বাড়ি ফিরল। ছেলের আবার কড়া হুকুম— 'তখনই দরজা খুলবি না হুট করে! খবরদার! দশবার নিশ্বাস ফেলতে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ অপেক্ষা করবি। তারপর দরজা খুলবি।' ...আরও কত রকমের টোকা মারবার রকমফের আছে। কতবার হয়েছে, কতবার বদলেছে। দুনিয়ায় বিশ্বাস করবে কাকে; পুলিশকে ঠেকানো যায়; কিন্তু দলের কারও মনে যখন পাপ ঢোকে তখন তাকে ঠেকানো হয় মুশকিল। দিনকালই পড়েছে অন্যরকম! সৌখীর বাপের মুখে শোনা যে, সেকালে দলের কে যেন জখম হয়ে ধরা পড়বার পর, নিজের হাতে নিজের জিব কেটে ফেলেছিল— পাছে পুলিশের কাছে দলের সম্বন্ধে কিছু বলে ফেলে সেই ভয়ে। আর আজকাল দেখো! সৌখী জেলে গিয়েছে আজ পাঁচ বছর; প্রথম দু বছর দলের লোক মাসে মাসে টাকা দিয়ে যেত; তিন বছর থেকে আর দেয় না। এ কী কখনও হতে পারত আগেকার কালে? ন্যায়-অন্যায় কর্তব্য-অকর্তব্যের পাটই কী একেবারে উঠে গেল দুনিয়া থেকে? সৌখীর বাপ কতবার জেলে গিয়েছে; সৌখীরও তো এর আগে দু-বার কয়েদ হয়েছে; কখনও তো দলের লোকে এর আগে এমন ব্যবহার করেনি। মাস না যেতেই হাতে টাকা এসে পৌঁছেছে— কখনও বা আগাম—তিন-চার মাসের একসঙ্গে। কিন্তু এবার দেখো তো কাণ্ড! একটা সংসার পয়সার অভাবে ভেসে গেল কিনা তা একবার উঁকি মেরে দেখল না দলের লোক! আগের বউমার শরীরটা ছিল ভালো। সৌখীর এবারকার বউটা রোগা-রোগা। তার উপর ছেলে হবার পর একেবারে ভেঙে গিয়েছে শরীর। সৌখী যখন একবার ধরা পড়ে, তখন বউমার ছেলে পেটে। হ্যাঁ, নাতিটার বয়স চার-পাঁচ বছর হল বইকি। কী কপাল নিয়ে এসেছিল! যার বাপের নামে চৌকিদারসাহেব কাঁপে, দারোগাসাহেব পর্যন্ত যার বাপকে তুইতোকারি করতে সাহস করেননি কোনোদিন, তারই কিনা দু-বেলা ভাত জোটে না! হায় রে কপাল! এ বউ যে খাটতে পারে না ওই রোগা শরীর নিয়ে। আমি বুড়ো মানুষ, কোনোরকমে বাড়ি বাড়ি গিয়ে দুটো খই-মুড়ি বেচে আসি। তা দিয়ে নিজের পেট চালানোই শক্ত। সাধে কী আর বউমাকে তার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে হল! তাছাড়া গয়লাবাড়ির মেয়ে। ঝি-চাকরের কাজও তো আমরা করতে পারি না। করলেই বা রাখত কে? সৌখীর মা-বউকে কি কেউ বিশ্বাস পায়! নইলে আমার কি ইচ্ছা করে না যে, বউ-নাতিকে নিয়ে ঘর করি! বেয়াইয়ের দুটো মোষ

আছে। তবু বউ-নাতিটার পেটে একটু একটু দুধ পড়ছে। ওদের শরীরে দরকার দুধের। আর বছরখানেক বাদেই তো সৌখী ছাড় পাবে। তখন বউকে নিয়ে এসে রুপোর গয়না দিয়ে মুড়ে দেবে। দেখিয়ে দেব পাড়ার লোকদের যে, সৌখীর মায়ের নাতি পথের ভিখিরি নয়। আসতে দাও না সৌখীকে! দলের ওই বদলোকগুলোকেও ঠান্ডা করতে হবে! আমি বলি, এসব একলসেঁড়ে লোকদের দলে না নিলেই হয়। ওরা কী ডাকাত নামের যুগ্যি; চোর, ছিঁচকে চোর! ওই যেটা টাকা দিতে আসত, সেটার চেহারা দেখেছ? তালপাতার সেপাই। থুতনির নীচে দু-গাছা দাড়ি! কালি-ঝুলিই মাখো, আর মশালই হাতে নাও, ওই রোগা-পটকাকে দেখে কেউ ভয় পাবে কস্মিনকালে?...

ঘুম আর আসতে চায় না। রোজ রাতেই এই অবস্থা। মাথা পর্যন্ত কম্বলের মধ্যে ঢুকিয়ে না নিলে তার কোনো কালেই ঘুম হয় না শীতের দিনে। ...একবার সৌখী কোথা থেকে রাত-দুপুরে ফিরে এসে টোকার সাড়া না পেয়ে, কী মারই মেরেছিল মাকে! বলে দিয়েছিল যে ফের যদি কোনোদিন নাকমুখ ঢেকে শুতে দেখি, তাহলে খুন করে ফেলে দেব! বাপের বেটা, তাই মেজাজ অমন কড়া। আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমুলেও একটা বকুনি দেবার লোক পর্যন্ত নেই বাড়িতে, গেল পাঁচ বছরের মধ্যে! এ কী কম দুঃখের কথা।...

ঘুমের অসুবিধা হলেও, ছেলের কথা মনে করে সে এক দিনের জন্যও নাকমুখ ঢেকে শোয়নি পাঁচ বছরের মধ্যে।

...বাইরে নোনা আতা গাছতলায় শুকনো পাতার উপর একটু খড়খড় করে শব্দ হল। গন্ধগোকুল কিংবা শিয়ালটিয়াল হবে বোধ হয়। কী খেতে যে এরা আসে বোঝা দায় ...বুড়ো হয়ে শীত বেড়েছে। আগে একখান কম্বলে কেমন দিব্যি চলে যেত। এ কম্বলখানা হয়েওছে অনেক কালের পুরোনো। এর আগের বার সৌখী জেল থেকে এনেছিল। সে কী আজকের কথা!

কম্বলখানার বয়স ক-বছর হবে তার হিসাব করতে গিয়ে বাধা পড়ে। টকটক করে টোকা পড়ার মতো শব্দ যেন কানে এল। টিকটিকির ডাক বোধ হয়! হাতি পাঁকে পড়লে ব্যাঙেও লাথি মারে! টিকটিকিটা সুদ্ধ খুনশুড়ি আরম্ভ করেছে মজা দেখবার জন্য। করে নে।

টকটক করে আবার দরজায় দুটো টোকা পড়ল।

...না। তাহলে টিকটিকি না তো। আওয়াজটা খনখনে—টিনের কপাটের উপর টোকা মারবার শব্দ!

বুড়ি উঠে বসে। ঘর গরম রাখার জন্য সে আগুন করেছিল মেঝেতে, সেটা কখন নিভে গিয়েছে; কিন্তু তার ধোঁয়া ঘরের অন্ধকারকে আরও জমাট করে তুলেছে।... এতদিনে কী তাহলে দলের হতভাগাগুলোর মনে পড়েছে সৌখীর মায়ের কথা?

আবার দরজায় দুটো টোকা পড়ল। আর সন্দেহ নেই! অনেক দিনের অনভ্যাসের পর এই সামান্য ব্যাপারটা বুড়ির মনের মধ্যে একটু উত্তেজনা এনেছে।

...তবু বলা যায় না। ...কে না কে...

সৌখীর মা আস্তে আস্তে উঠে দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। বন্ধ কপাটের ফাঁক দিয়ে বাইরের লোকটাকে দেখবার চেষ্টা করল। ...লোকটাও বোধ হয় কপাটের ফাঁক দিয়ে ভিতরে দেখবার চেষ্টা

করছে। বাইরেও ঘুটঘুটে অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না। বিড়ির গন্ধ নাকে আসছে। ...আবার টোকা পড়ল দুটো। এবার একেবারে কানের কাছে। এ টোকা পড়বার কথা ছিল না! অবাক কাণ্ড! তাহলে তো লোকটা টাকা দিতে আসেনি! পুলিশের লোকটোক নয় তো? টোকা মারবার নিয়মকানুনগুলো হয়তো ভালো জানে না! ...সৌখীর ছাড়া পাবার যে এখনও বহু দেরি! ...নিশ্চয়ই পুলিশের লোক! তবে তুমি যে-ই হও, টাকা দিলে নিশ্চয়ই নিয়ে নেব; তারপর অন্য কথা। ...কথা বলতে হবে সাবধানে; দলের কারও নামধাম আবার মুখ দিয়ে বেরিয়ে না পড়ে অজান্তে ।...

হঠাৎ মনে পড়ল, হুড়কো খুলবার আগে দশবার নিশ্বাস ফেলবার কথা। মানসিক উত্তেজনায় নিশ্বাস পড়ছেই না তা গুনবে কী। ...বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করছে। বুড়ি তাড়াতাড়ি দশবার নিশ্বাস ফেলে নিয়মরক্ষা করে নিল।

'কে?'

দরজা খুলে সম্মুখে এক লম্বাচওড়া লোককে দেখে ডাকাতের মায়েরও গা ছমছম করে।

'ঘর যে একবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার। ঢুকি কী করে?'

'কে, সৌখী। ওমা তুই। আমি ভাবি কে না কে।'

বুড়ি ছেলেকে জড়িয়ে ধরেছে। ...এ ছেলে বুড়ো হয়েও সেই একই রকম থেকে গেল। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ফিরছে; বুক ফুলিয়ে পাড়া জাগিয়ে ঢুকতে পারত বাড়িতে অনায়াসে। কিন্তু দরজায় টোকা মেরে মা-র সঙ্গে খুনশুড়ি হচ্ছিল এতক্ষণ। ...এ আনন্দ তার রাখবার জায়গা নেই।...

'লাটসাহেব জেল দেখতে গিয়েছিল। আমার কাজ দেখে খুশি হয়ে ছেড়ে দেবার হুকুম দিয়ে দিল। খুশি আর কী। হেড জমাদার সাহেবকে টাকা খাইয়েছিলুম। সেই সুপারিশ করে দিয়েছিল জেলারবাবুর কাছে। তাই বেশি রেমিশন পেয়ে গেলাম। আচ্ছা, তুই কুপিটা জ্বাল তো আগে। তারপর সব কথা হবে।'

দরকারের চাইতেও জোরে কথাগুলো বলল সৌখী যাতে ঘরের অন্য সকলেও শুনতে পায়। তারপর মাকে কেরোসিন তেলের টেমিটাকে খুঁজতে সাহায্য করবার জন্য দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে তুলে ধরে।

বুড়ি এতক্ষণে আলোতে মুখ দেখতে পেল ছেলের। চুলে বেশ পাক ধরেছে এবার; তাই বাপের মুখের আদল ধরা পড়ছে ছেলের মুখে। রোগা-রোগা লাগছে যেন। সৌখীটার তো বাপের মতো জেলে গেলে শরীর ভালো হয়। তবে এবার এমন কেন? ছেলের চোখের চাউনি ঘরের দূর দেয়াল পর্যন্ত কী যেন খুঁজছে। কাদের খুঁজছে সে কথা আর বুড়িকে বুঝিয়ে বলে দিতে হবে না।...

'হ্যাঁরে, জেলে তোর অসুখ-বিসুখ করেছিল নাকি?'

সৌখী এ প্রশ্ন কানে তুলতে চায় না; জিজ্ঞাসা করে, 'এদের কাউকে দেখছি না?'

প্রতি মুহূর্তে বুড়ি এই প্রশ্নের ভয়ই করছিল। জানা কথা যে, জিজ্ঞাসা করবেই; ...তবু...

'বউ বাপের বাড়ি গিয়েছে।'

'হঠাৎ বাপের বাড়ি?'

...এতদিন পর বাড়ি ফিরেছে ছেলে। এখনই সব কথা খুলে বলে তার মেজাজ খারাপ করে দিতে চায় না। মরদের রাগ। শুনেই এখনই হয়তো ছুটবে রাগের মাথায় দলের লোকের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে।

...নাতি আর বউয়ের শরীর খারাপের কথাও এখনই বলে কাজ নেই। ছেলে ছেলে করে মরে সৌখী। আগের বউটার ছেলেপিলে হয়ইনি। এ বউয়ের ওই একটিই তো টিমটিম করছে। তার শরীর খারাপের কথা শুনলে হয়তো সৌখী এখানে আর একদিনও থাকবে না। এতদিন পর এল। একদিনও কাছে রাখতে পারব না? খেয়ে-দেয়ে জিরিয়ে সুস্থির হয়ে থাকুক এক-আধদিন। তারপর সব কথা আস্তে আস্তে বলা যাবে। ...

'কেন, মেয়েদের কী মা-বাপকে দেখতে ইচ্ছে করে না একবারও?'

'না না, তাই কী বলছি নাকি?' অপ্রতিভের চেয়ে হতাশ হয়েছে বেশি সৌখী। তার বাড়ি ফিরবার আনন্দ অর্ধেক হয়ে গিয়েছে মুহূর্তের মধ্যে। ছেলেটা কেমন দেখতে হয়েছে, তাই নিয়ে কত কল্পনার ছবি এঁকেছে জেলে বসে বসে। ছেলে কেমন করে গল্প করে মায়ের সঙ্গে তাই শুনবার জন্য টোকা মারবার আগে দরজায় কান ঠেকিয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। ভেবেছিল রাত নটার মধ্যে দুরন্ত ছেলেটা নিশ্চয়ই ঘুমোবে না। সে মনে মনে ঠিক করে ফেলে যে...কালই সে যাবে শ্বশুরবাড়ি বউছেলেকে নিয়ে আসতে। এ কথা এখনই মাকে বলে ফেলা ভালো দেখায় না; নইলে মা আবার ভাববে যে নতুন বউ এসে ছেলেকে পর করে নিয়েছে। ...মা কত কী বলে চলেছে; এতক্ষণে শেষের কথাটা কানে গেল।

'নে, হাতমুখ ধুয়ে নে।'

'না না। আমি খেয়ে এসেছি। এই রাত করে আর তোকে রাঁধতে বসতে হবে না।'

'না, রাঁধছে কে। খইমুড়ি আছে। খেয়েনে। তুই যে কত খেয়ে এসেছিস, সে আর আমি জানি না।'

ব্যবসার পুঁজি খইমুড়িগুলো শেষ করে শোয়ার সময় তার হঠাৎ নজর গেল মা-র গায়ের ছেঁড়া কম্বলখানার দিকে।

'ওখান আমাকে দে।'

আপত্তি ঠেলে সৌখী নিজের গায়ের নতুন কম্বলখানা মায়ের গায়ে জড়িয়ে দিল।

নতুন কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েও বুড়ির ঘুম আসতে চায় না। পা কিছুতেই গরম হয় না, রাজ্যের দুশ্চিন্তায় মাথা গরম হয়ে উঠেছে। সৌখীর নাকডাকানির একঘেয়ে শব্দ কানে আসছে। এতদিন পর ছেলে বাড়ি এল; কোথায় নিশ্চিন্ত হবে, তা নয়, সৌখীকে কী খেতে দেবে কাল সকালে, সেই হয়েছে বুড়ির মস্ত ভাবনা। আজকের রাতটা না হয় বিক্রির খইমুড়ি দিয়ে কোনোরকমে চলে গেল। ...যদি বলত দুটো ভাত খেতে ইচ্ছা করছে, তাহলেই আর উপায় ছিল না, সব কথা না বলে। ...আলু-চচ্চড়ি খেতে কী ভালোই বাসে সৌখীটা! কতকাল হয়তো জেলে খেতে পায়নি। আলু, চাল, সরষের তেল সবই কিনতে হবে। অত পয়সা পাব কোথায়? ভোরে উঠেই কী ছেলেকে বলা যায় যে, আগে পয়সা জোগাড় করে আন, তবে রেঁধে দেব!...

...কাছারির ঘড়িতে দুটো বাজল। ...ভেবে কূলকিনারা পাওয়া যায় না।...

মনে পড়ল যে, পেশকারসাহেবের বাড়ি রাজমিস্ত্রি লেগেছে। আজ যখন মুড়ি বেচতে গিয়েছিল তখন দেখেছে যে, পড়ে-যাওয়া উত্তরের পাঁচিলটা গাঁথা হচ্ছে। বুড়ি বিছানা থেকে উঠে পা টিপে টিপে বেরোল ঘর থেকে।

মাতাদিন পেশকারের বাড়ি বেশি দূরে নয়। পাঁচিল সেদিন হাত দুই-আড়াই উঁচু পর্যন্ত গাঁথা হয়েছে। মাটি আর ভাঙা ইটের পাহাড় নীচে পড়ে থাকায়, সে পাঁচিল ভাঙতে বুড়ির বিশেষ অসুবিধা হল না।... বাড়ি নিশুতি!...

অন্ধকারে কী কোথায় আছে ঠাহর করা শক্ত। বারান্দায় দোরগোড়ায় গুছিয়ে রাখা রয়েছে পেশকার সাহেবের খড়মজোড়া, আর জলভরা ঘটি—ভোরে উঠেই দরকার লাগবে বলে।

ভয়ে বুড়ি উঠোনের আর কোথায় কী আছে, হাতড়ে হাতড়ে খুঁজবার চেষ্টা করল না। ঘটিটি তুলে নিয়ে পাঁচিল টপকে বাইরে বেরিয়ে এল নিঃশব্দে। জলটুকু পর্যন্ত ফেলেনি।... এখন রাতদুপুরে লোটা হাতে যেতে দেখলেও কেউ সন্দেহ করবে না।

এদেশে লোটা বিনা সংসার অচল। দিনে বারকয়েক লোটা না মাজলে মাতাদিন পেশকারের হাত নিশপিশ করে। সেইজন্য হুলস্থূল পড়ে গেল তাঁর বাড়িতে সকালবেলায়।

খোকার মা নাকে কেঁদে স্বামীকে মনে করিয়ে দিলেন যে, লোটা হল বাড়ির লক্ষ্মী; ...এখনই আর একটি কিনে আনা দরকার বাড়ির লক্ষ্মীশ্রী ফিরিয়ে আনতে হলে। কর্তার মেজাজ তখন তিরিক্ষি হয়ে আছে চোরের উপর রাগে।—'বাজে বক্‌বক্ কোরো না। তোমাদের তো কেবল এই! আইনের ধারায় স্পষ্ট লেখা আছে যে, চুরির খবর পুলিশকে না দিলে জেল পর্যন্ত হতে পারে; সে খবর রাখো?'

আইনচঞ্চু মাতাদিন আরও অনেক ঝাঁঝালো কথা খোকার মাকে শোনাতে শোনাতে বাড়ি থেকে বার হয়ে গেলেন থানায় খবর দেবার জন্য।

ফিরতিমুখো তিনি এলেন বাসনের দোকানে। নানা রকম ঘটি দেখাল দোকানদার; কিন্তু পছন্দসই কিছুতেই পাওয়া গেল না। পেশকারসাহেব বড়ো খুঁতখুতে লোটা সম্বন্ধে। তিনি চান খুরো-দেওয়া লোটা—বুঝলেন কিনা—এই এত বড়ো সাইজের—মুখ হওয়া চাই বেশ ফাঁদালো—যাতে বেশ হৃষ্টপুষ্ট মেয়েমানুষের এতখানি মোটা রুপোর কাঁকনসুদ্ধ হাত অনায়াসে ঢোকানো যায়, ভিতরটা মাজবার জন্য। ...দোকানদার শেষকালে হাল ছেড়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করে—'পুরোনো হলে চলবে? নামেই পুরোনো। সস্তায় পাবেন। আড়াই টাকায়।'

'পুরোনো বাসনও বিক্রি হয় নাকি এখানে? দেখি।'

ঘটি দেখেই তাঁর খটকা লাগল। পকেট থেকে চশমা জোড়া বার করে নাকের ডগায় বসালেন। ...খুরোর নীচে ঠিক সেই তারা আঁকা! আর সন্দেহ নেই!...

মাতাদিন পেশকার আইনের ধারা ভুলে গিয়ে দোকানদারের টুটি চেপে ধরেন। —'বল! এ লোটা কোত্থেকে পেলি? দিনে করিস দোকানদারি—আর রাতে বার হস সিঁধকাঠি নিয়ে!'

একেবারে হই-হই-রই-রই কাণ্ড। দোকানে লোক জড় হয়ে গেল। দোকানদার বলে যে, সে কিনেছে এই ঘটি নগদ চোদ্দো আনা পয়সা গুনে, সৌখীর মায়ের কাছ থেকে—এই কিছুক্ষণ মাত্র আগে।

'চোদ্দো আনায় এই ঘটি পাওয়া যায়? চোরাই মাল জেনেই কিনেছিস! চোরাই মাল রাখবার ফৌজদারি ধারা জানিস?'

পেশকারসাহেব থানায় পাঠিয়ে দিলেন একজন ছোকরাকে, দারোগাকে ডেকে আনবার জন্য। চোর ধরা পড়বার পর দারোগাসাহেবের কাজে আর ঢিলেমি নেই। তখনই সাইকেলে এসে হাজির। সব ব্যাপার

শুনে তিনি সদলবলে সৌখীর বাড়িতে গিয়ে ঠেলে উঠলেন। সৌখীর মা আলুর তরকারি চড়িয়েছে উনোনে। ছেলে তখনও ওঠেনি বিছানা ছেড়ে।

অনেককাল জেলে ঘড়ি ধরে সকাল সকাল উঠতে হয়েছে; নতুন পাওয়া স্বাধীনতা উপভোগ করবার জন্য সৌখী মনে মনে ঠিক করেছে যে বেলা বারোটার আগে সে কিছুতেই আজ বিছানা ছেড়ে উঠবে না।

দারোগা-পুলিশ দেখে বুড়ির বুক কেঁপে ওঠে। পুলিশ দেখে ভয় পাবার লোক সে নয়; এর আগে কতবার সময়ে অসময়ে পুলিশকে তাদের বাড়িতে হানা দিতে দেখেছে। কিন্তু আজ যে ব্যাপার অন্য! মাতাদিন পেশকার আর বাসনওয়ালা যে পুলিশের সঙ্গে রয়েছে! তার যে ধারণা ছিল, বাসনওলা পুরোনো বাসনগুলোকে রং-চং দিয়ে নতুনের মতো না করে নিয়ে বিক্রি করে না... পাঁচ-সাত বছর আগে পুলিশ একবার ভোররাত্রে তাদের বাড়ি ঘেরাও করছিল, বন্দুকের খোঁজে। তখন তো মাথা হেঁট হয়নি তার। ডাকাতি করা তার স্বামী পুত্রের হকের নেশা। সে তো মরদের কাজ; গর্বের জিনিস। জেলে যাওয়া সেক্ষেত্রে দূরদৃষ্টি মাত্র—তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। কিন্তু এ যে চুরি! ...ছিঁচকে চোরের কাজ, শেষকালে...

লজ্জায় সৌখীর মা অভিযোগ অস্বীকার করতে পর্যন্ত ভুলে গিয়েছে!

দারোগাসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, তাকে, 'তুই এই লোটা আজ বাজারে বাসনের দোকানে চোদ্দো আনায় বিক্রি করেছিস।'

কোনো জবাব বেরোল না বুড়ির মুখ দিয়ে। শুধু একবার ছেলের দিকে তাকিয়ে সে মাথা হেঁট করে নিল।

এতক্ষণে বোঝে সৌখী ব্যাপারটা। চোদ্দো আনা পয়সার জন্য মা শেষকালে একটা ঘটি চুরি করল! ...কেন মা তাকে বলল না! ...এতদিন তার ডিউটি ছিল জেলখানার গুদামে। জেলের ঠিকেদারদের কাছ থেকে সে নব্বই টাকা রোজগার করে এনেছে। এখনও সে টাকা তার কোমরের বাটুয়ায় রয়েছে। মা তার কাছ থেকে চেয়ে নিল না কেন? মেয়েমানুষের আর কত আক্কেল হবে! হয়তো ঘরদোরের দিকে তাকিয়ে এক নজরেই সংসারের দৈন্যদশার কথা আঁচ করে নেওয়া উচিত ছিল তার!... বুঝে, নিজে থেকেই মায়ের হাতে টাকা দেওয়া উচিত ছিল। ...কিন্তু সে সময় পেল কই? রাতে এসে শুয়েছে; এতক্ষণ তো বিছানা ছেড়ে ওঠেইনি। ...শেষ পর্যন্ত লোটা চুরি! জেলের মধ্যে ওই সব ছিঁচকে 'কদুচোর'দের সঙ্গে সে যে পারতপক্ষে কথা বলেনি কোনো দিন!... ডাকাতরা জেলে আলাপ-সালাপ করে 'লাইফার'দের সঙ্গে, এ কথা তো মায়ের অজানা নয়।... 'কদুচোর'দের যে মাত্র দু-মাস তিন মাসের সাজা হয়।... মা কি জানে না যে...

'এই বুড়ি! আমার কথার উত্তর দিচ্ছিস না কেন? বল। জবাব দে।'

বুড়ি নির্বাক। দারোগাবাবুর প্রশ্ন কানে গেল কী না, সে কথা বোঝাও যার না তার মুখ দেখে।

আর থাকতে পারল না সৌখী।

'দারোগাসাহেব, মেয়েমানুষকে নিয়ে টানাটানি করছেন কেন? আমি ঘটি চুরি করেছি কাল রাত্রে।'

বিজ্ঞ দারোগাবাবু তাঁর অনুচরদের দিকে বিজয়ীর দৃষ্টি হেনে ভাব দেখাতে চাইলেন যে, এত বেলা পর্যন্ত সৌখীদের ঘুমোতে দেখে, এ তিনি আগেই বুঝেছিলেন; শুধু বুড়ির মুখ দিয়ে কথাটা বার করে নিতে চাচ্ছিলেন এতক্ষণ।

এইবার সৌখীর মা ভেঙে পড়ল।...ছেলের নামে কলঙ্ক এনেছে সে।...

'না না দারোগাসাহেব! সৌখী করেনি, আমি করেছি। ওকে গ্রেপ্তার করবেন না। আমাকে করুন। ও কিছু জানে না। ও যে ঘুমুচ্ছিল। ওকে ছেড়ে দিন দারোগাসাহেব। এখনও যে বউ-ছেলের সঙ্গে দেখা হয়নি ওর।...'

দারোগাবাবুর পায়ের উপর মাথা কুটছে বুড়ি।

কিন্তু তিনি বাসনওলা কিংবা এই বুড়িটাকে নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না; তাঁর দরকার আসল অপরাধীকে নিয়ে।

সৌখী যাবার সময় কোমর থেকে বাটুয়াটা বার করে রেখে দিয়ে গেল খাটিয়ার উপর।

মা তখনও মেঝেতে পড়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। উনোনে চড়ানো আলুর তরকারির পোড়া গন্ধ সারা পাড়ায় ছড়িয়ে পড়েছে।

সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-১৯৬৫) : জন্ম বিহারের পূর্ণিয়ায়। অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেওয়ার পর আইন পাশ করে আইনজীবী বাবার সঙ্গে কিছুকাল ওকালতি করেন। পরে সেই কাজ ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়ে পুর্ণিয়ার গ্রামাঞ্চলে গঠনমূলক কাজ করতে থাকেন। জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিয়ে ১৯৪০ থেকে ১৯৪৪-এর মধ্যে দীর্ঘ সময় কারাবাস করেন। ১৯৪৮ সালে কংগ্রেস ত্যাগ করে সমাজতন্ত্রী দলে যোগ দেন। ১৯৪৫-এ রচিত উপন্যাস 'জাগরী' তাঁকে খ্যাতি এনে দেয়। এই গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কারও পান (১৯৫০)। এছাড়াও '*ঢোঁড়াই চরিতমানস*', '*চিত্রগুপ্তের ফাইল*' প্রভৃতি তাঁর বিশিষ্ট গ্রন্থ। তাঁর ছোটোগল্পগুলিও জোরালো বক্তব্য ও ভাষার জন্য সমান জনপ্রিয়। তাঁর গল্পসংকলনগুলির মধ্যে রয়েছে *গণনায়ক, অপরিচিতা, চকাচকী, পত্রলেখার বাবা, জলভ্রমি* প্রভৃতি। তাঁর গল্পে সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

প্র ব ন্ধ

সুয়েজখালে : হাঙ্গর শিকার

স্বামী বিবেকানন্দ

১৪ জুলাই রেড-সি পার হয়ে জাহাজ সুয়েজ পৌঁছুল। সামনে সুয়েজখাল। জাহাজে সুয়েজে নাবাবার মাল আছে। তার উপরে এসেছেন মিশরে প্লেগ, আর আমরা আনছি প্লেগ সম্ভবত — কাজেই দোতরফা ছোঁয়া-ছুঁয়ির ভয়। এ ছুঁৎছাঁতের ন্যাটার কাছে আমাদের দিশি ছুঁৎছাত কোথায় লাগে! মাল নাববে, কিন্তু সুয়েজের কুলি জাহাজ ছুঁতে পারবে না। জাহাজে খালাসি বেচারাদের আপদ আর কী! তারাই কুলি হয়ে ক্রেনে করে মাল তুলে, আলটপ্‌কা নীচে সুয়েজি নৌকায় ফেলছে— তারা নিয়ে ডাঙায় যাচ্চে। কোম্পানির এজেন্ট ছোটো লঞ্চে করে জাহাজের কাছে এসেছেন, ওঠবার হুকুম নেই। কাপ্তেনের সঙ্গে জাহাজে নৌকায় কথা হচ্ছে। এ তো ভারতবর্ষ নয় যে, গোরা আদমি— প্লেগ আইন-ফাইন সকলের পার— এখানে ইউরোপের আরম্ভ। স্বর্গে ইঁদুর-বাহন প্লেগ পাছে ওঠে, তাই এত আয়োজন। প্লেগ-বিষ—প্রবেশ থেকে দশ দিনের মধ্যে ফুটে বেরোন; তাই দশ দিনের আটক। আমাদের কিন্তু দশ দিন হয়ে গেছে—ফাঁড়া কেটে গেছে। কিন্তু মিশরি আদমিকে ছুঁলেই আবার দশ দিন আটক—তাহলে আর নেপল্‌সেও লোক নাবানো হবে না, মার্সাইতেও নয়; কাজেই যা কিছু কাজ হচ্ছে, সব আলগোছে; কাজেই ধীরে ধীরে মাল নাবাতে সারাদিন লাগবে। রাত্রিতে জাহাজ অনায়াসেই খাল পার হতে পারে, যদি সামনে বিজলী-আলো পায়; কিন্তু সে আলো পরাতে গেলে, সুয়েজের লোককে জাহাজ ছুঁতে হবে, ব্যাস্ — দশ দিন কারাঁটিন্ (quarantine)। কাজেই রাতেও যাওয়া হবে না, চব্বিশ ঘণ্টা এইখানে পড়ে থাকো— সুয়েজ বন্দরে।

এটি বড়ো সুন্দর প্রাকৃতিক বন্দর, প্রায় তিন দিকে বালির ঢিপি আর পাহাড়— জলও খুব গভীর। জলে অসংখ্য মাছ আর হাঙ্গর ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। এই বন্দরে আর অস্ট্রেলিয়ার সিডনি বন্দরে যত হাঙ্গর, এমন আর দুনিয়ার কোথাও নাই—বাগে পেলেই মানুষকে খেয়েছে। জলে নাবে কে? সাপ আর হাঙ্গরের ওপর মানুষেরও জাতক্রোধ; মানুষও বাগে পেলে ওদের ছাড়ে না।

সকাল বেলা খাবার-দাবার আগেই শোনা গেল যে, জাহাজের পেছনে বড়ো বড়ো হাঙ্গর ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। জলজ্যান্ত হাঙ্গর পূর্বে আর কখনও দেখা যায়নি— গতবারে আসবার সময়ে সুয়েজে জাহাজ অল্পক্ষণই ছিল, তাও আবার শহরের গায়ে। হাঙ্গরের খবর শুনেই, আমরা তাড়াতাড়ি উপস্থিত। সেকেন্ড কেলাসটি জাহাজের পাছার উপর—সেই ছাদ হতে বারান্দা ধরে কাতারে কাতারে স্ত্রী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে ঝুঁকে হাঙ্গর দেখছে। আমরা যখন হাজির হলুম, তখন হাঙ্গর-মিঞারা একটু সরে গেছেন; মনটা বড়োই ক্ষুণ্ণ হল। কিন্তু দেখি যে, জলে গাঙ্‌ধাড়ার মতো এক প্রকার মাছ ঝাঁকে ঝাঁকে ভাসছে। আর এক রকম খুব ছোটো মাছ জলে থিক্ থিক্ করছে। মাঝে মাঝে এক একটা বড়ো মাছ, অনেকটা ইলিশ মাছের চেহারা, তিরের মতো

এদিক ওদিক করে দৌড়োচ্ছে। মনে হল, বুঝি উনি হাঙ্গরের বাচ্চা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করে জানলুম—তা নয়, ওর নাম বনিটো। পূর্বে ওর বিষয় পড়া গেছিল বটে; এবং মালদ্বীপ হতে উনি শুঁটকিরূপে আমদানি হন হুড়ি চড়ে —তাও পড়া ছিল। ওর মাংস লাল ও বড়ো সুস্বাদ —তাও শোনা আছে। এখন ওর তেজ আর বেগ দেখে খুশি হওয়া গেল। অত বড়ো মাছটা তিরের মতো জলের ভিতর ছুটছে, আর সে সমুদ্রের কাচের মতো জল, তার প্রত্যেক অঙ্গ-ভঙ্গি দেখা যাচ্ছে। বিশ মিনিট, আধঘণ্টা টাক, এই প্রকার বনিটোর ছুটোছুটি আর ছোটো মাছের কিলিবিলি তো দেখা যাচ্ছে। আধ ঘণ্টা, তিন কোয়ার্টার —ক্রমে তিতিবিরক্ত হয়ে আসছি, এমন সময়ে একজন বললে — ওই ওই! দশ বারোজনে বলে উঠল— ওই আসছে, ওই আসছে! চেয়ে দেখি, দূরে একটা প্রকাণ্ড কালো বস্তু ভেসে আসছে, পাঁচ সাত ইঞ্চি জলের নীচে। ক্রমে বস্তুটা এগিয়ে আসতে লাগল। প্রকাণ্ড থ্যাবড়া মাথা দেখা দিলে; সে গদাইলস্করি চাল, বনিটোর সোঁ সোঁ তাতে নেই; তবে একবার ঘাড় ফেরালেই একটা মস্ত চক্কর হল। বিভীষণ মাছ; গম্ভীর চালে চলে আসছে— আর আগে আগে দু-একটা ছোটো মাছ; আর কতকগুলো ছোটো মাছ তার পিঠে গায়ে পেটে খেলে বেড়াচ্ছে। কোনো কোনোটা বা জেঁকে তার ঘাড়ে চড়ে বস্‌ছে। ইনিই সসাঙ্গোপাঙ্গ হাঙ্গর। যে মাছগুলি হাঙ্গরের আগে আগে যাচ্ছে, তাদের নাম 'আড়কাটি— পাইলট ফিস্।' তারা হাঙ্গর শিকার দেখিয়ে দেয় আর বোধ হয় প্রসাদটা-আসাদটা পায়। কিন্তু হাঙ্গরের সে মুখ-ব্যাদান দেখলে তারা যে বেশি সফল হয়, তা বোধ হয় না। যে মাছগুলি আশেপাশে ঘুরছে, পিঠে চড়ে বসছে, তারা হাঙ্গর-'চোষক'। তাদের বুকের কাছে প্রায় চার ইঞ্চি লম্বা ও দুই ইঞ্চি চওড়া চ্যাপটা গোলপানা একটি স্থান আছে। তার মাঝে, যেমন ইংরেজি অনেক রবারের জুতোর তলায় লম্বা লম্বা জুলি-কাটা কিরকিরে থাকে, তেমনি জুলিকাটাকাটা। সেই জায়গাটা ওই মাছ, হাঙ্গরের গায়ে দিয়ে চিপসে ধরে; তাই হাঙ্গরের গায়ে পিঠে চড়ে চলছে দেখায়। এরা নাকি হাঙ্গরের গায়ের পোকা-মাকড় খেয়ে বাঁচে। এই দুই প্রকার মাছ পরিবেষ্টিত না হয়ে হাঙ্গর চলেন না। আর এদের, নিজের সহায়-পারিষদ জ্ঞানে কিছু বলেনও না। এই মাছ একটা ছোটো হাতসুতোয় ধরা পড়ল। তার বুকে জুতোর তলা একটু চেপে দিয়ে বা তুলতেই সেটা পায়ের সঙ্গে চিপসে উঠতে লাগল; ওই রকম করে সে হাঙ্গরের গায়ে লেগে যায়।

সেকেন্ড কেলাসের লোকগুলির বড়োই উৎসাহ। তাদের মধ্যে একজন ফৌজি লোক— তার তো উৎসাহের সীমা নেই। কোথা থেকে জাহাজ খুঁজে একটি ভীষণ বঁড়শির জোগাড় করলে, সে 'কুয়োর ঘটি তোলার' ঠাকুরদাদা। তাতে সেরখানেক মাংস আচ্ছা দড়ি দিয়ে জোর করে জড়িয়ে বাঁধলে। তাতে এক মোটা কাছি বাঁধা হল। চার হাত বাদ দিয়ে, একখানা মস্ত কাঠ ফাতনার জন্য লাগানো হল। তারপর ফাতনা সুদ্ধ বঁড়শি, ঝুপ করে জলে ফেলে দেওয়া হল। জাহাজের নীচে একখান পুলিশের নৌকা— আমরা আসা পর্যন্ত চৌকি দিচ্ছিল, পাছে ডাঙার সঙ্গে আমাদের কোনোরকম ছোঁয়াছুঁয়ি হয়। সেই নৌকার উপর আবার দুজন দিব্বি ঘুমুচ্ছিল, আর যাত্রীদের যথেষ্ট ঘৃণার কারণ হচ্ছিল। এক্ষণে তারা বড়ো বন্ধু হয়ে উঠল। হাঁকাহাঁকির চোটে আরব মিঞা চোখ মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়ালেন। কী একটা হাঙ্গামা উপস্থিত বলে কোমর আঁটবার জোগাড় করছেন, এমন সময়ে বুঝতে পারলেন যে এত হাঁকাহাঁকি, কেবল তাঁকে — কড়িকাষ্ঠরূপ হাঙ্গর ধরবার ফাতনাটিকে টোপ সহিত কিঞ্চিৎ দূরে সরিয়ে দেবার অনুরোধ ধ্বনি। তখন তিনি নিশ্বাস ছেড়ে, আকর্ণ-বিস্তার হাসি হেসে একটা বল্লির ডগায় করে ঠেলেঠুলে ফাতনাটাকে তো দূরে ফেললেন; আর আমরা উদগ্রীব হয়ে, পায়ের ডগায় দাঁড়িয়ে বারান্দায় ঝুঁকে, ওই আসে ওই আসে— শ্রীহাঙ্গরের জন্য 'সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পন্থানং' হয়ে রইলাম; এবং যার জন্যে মানুষ ওই প্রকার ধড়্‌ফড়্ করে, সে চিরকাল যা করে, তাই হতে লাগলো— অর্থাৎ 'সখি শ্যাম না এল'। কিন্তু

সকল দুঃখেরই একটা পার আছে। তখন সহসা জাহাজ হতে প্রায় দুশ' হাত দূরে, বৃহৎ ভিস্তির মশকের আকার কী একটা ভেসে উঠল; সঙ্গে সঙ্গে, 'ওই হাঙ্গর, ওই হাঙ্গর' — রব। 'চুপ চুপ্ — ছেলের দল! হাঙ্গর পালাবে।' 'বলি, ওহে! সাদা টুপিগুলো একবার নাবাও না, হাঙ্গরটা যে ভড়কে যাবে' — ইত্যাকার আওয়াজ যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করছে, তাবৎ সেই হাঙ্গর লবণসমুদ্রজন্মা, বঁড়শিসংলগ্ন শোরের মাংসের তালটি উদরাগ্নিতে ভস্মাবশেষ করবার জন্যে, পালভরে নৌকার মতো সোঁ করে সামনে এসে পড়লেন। আর পাঁচ হাত—এইবার হাঙ্গরের মুখ টোপে ঠেকেছে। সে ভীম পুচ্ছ একটু হেলল— সোজা গতি চক্রাকারে পরিণত হল। যাঃ হাঙ্গর চলে গেল যে হে! আবার পুচ্ছ একটু বাঁকল, আর সেই প্রকাণ্ড শরীর ঘুরে, বঁড়শিমুখো দাঁড়াল। আবার সোঁ করে আসছে—ওই হাঁ করে বঁড়শি ধরে ধরে! আবার সেই পাপ লেজ নড়ল, আর হাঙ্গর শরীর ঘুরিয়ে দূরে চলল। আবার ওই চক্র দিয়ে আসছে, আবার হাঁ করছে; ওই— টোপটা মুখে নিয়েছে, এইবার —ওই ওই চিতিয়ে পড়ল; হয়েছে, টোপ খেয়েছে —টান টান টান, ৪০/৫০ জনে টান, প্রাণপণে টান। কী জোর মাছের! কী ঝটাপট— কী হাঁ। টান টান। জল থেকে এই উঠল, ওই যে জলে ঘুরছে, আবার চিতুচ্চে, টান টান। যাঃ, টোন খুলে গেল! হাঙ্গর পালাল। তাই তো হে, তোমাদের কী তাড়াতাড়ি বাপু! একটু সময় দিলে না টোপ খেতে! যেই চিতিয়েছে অমনি কি টানতে হয়? আর —'গতস্য শোচনা নাস্তি', হাঙ্গর তো বঁড়শি ছাড়িয়ে চোঁচা দৌড়। আড়কাটি মাছকে উপযুক্ত শিক্ষা দিলে কিনা তা খবর পাইনি, মোদ্দা— হাঙ্গর তো চোঁচা। আবার সেটা ছিল 'বাঘা' — বাঘের মতো কালো কালো ডোরা কাটা। যা হোক্ 'বাঘা' বঁড়শি সন্নিধি পরিত্যাগ করবার জন্য, স-'আড়কাটি' - 'রক্তচোষা' অন্তর্দধে।

কিন্তু নেহাত হতাশ হবার প্রয়োজন নেই —ওই যে পলায়মান 'বাঘার' গা ঘেঁষে আর একটা প্রকাণ্ড 'থ্যাব্ড়ামুখো' চলে আসছে! আহা হাঙ্গরদের ভাষা নেই। নইলে 'বাঘা' নিশ্চিত পেটের খবর তাকে দিয়ে সাবধান করে দিত। নিশ্চিত বলত, 'দেখো হে সাবধান, ওখানে একটা নূতন জানোয়ার এসেছে, বড়ো সুস্বাদ সুগন্ধ মাংস তার, কিন্তু কী শক্ত হাড়! এতকার হাঙ্গর-গিরি করছি, কত রকম জানোয়ার — জ্যান্ত, মরা, আধমরা—উদরস্থ করেছি, কত রকম হাড়-গোড়, ইট-পাথর, কাঠ-টুকরো পেটে পুরেছি, কিন্তু এ হাড়ের কাছে আর সব মাখম হে—মাখম! এই দেখো না—আমার দাঁতের দশা, চোয়ালের দশা কী হয়েছে'—বলে একবার সেই আকটিদেশ-বিস্তৃত মুখ ব্যাদান করে আগন্তুক হাঙ্গরকে অবশ্যই দেখাত। সেও প্রাচীন বয়স-সুলভ অভিজ্ঞতা সহকারে —চ্যাঙ মাছের পিত্তি, কুঁজো-ভেটকির পিলে, ঝিনুকের ঠান্ডা সুরুয়া ইত্যাদি সমুদ্রজ মহৌষধির কোনো-না-কোনোটা ব্যবহারের উপদেশ দিতই দিত। কিন্তু যখন ওসব কিছুই হল না, তখন হয় হাঙ্গরদের অত্যন্ত ভাষার অভাব, নতুবা ভাষা আছে, কিন্তু জলের মধ্যে কথা কওয়া চলে না! অতএব যতদিন না কোনো প্রকার হাঙ্গুরে অক্ষর আবিষ্কার হচ্ছে, ততদিন সে ভাষার ব্যবহার কেমন করে হয়? —অথবা 'বাঘা' মানুষ-ঘেঁষা হয়ে মানুষের ধাত পেয়েছে, তাই 'থ্যাব্ড়াকে আসল খবর কিছু না বলে, মুচ্‌কে হেসে, 'ভালো আছ তো হে' বলে সরে গেল। —'আমি একাই ঠকব?'

'আগে যান ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়ে, পাছু পাছু যান গঙ্গা....' শঙ্খধ্বনি তো শানা যায় না, কিন্তু আগে আগে চলেছেন 'পাইলট ফিস্' আর পাছু পাছু পকাণ্ড শরীর নাড়িয়ে আসছেন 'থ্যাব্ড়া', তাঁর আশেপাশে নেত্য করছেন 'হাঙ্গর-চোষা' মাছ। আহা ও লোভ কী ছাড়া যায়? দশ হাত দরিয়ার উপর ঝিক্ ঝিক্ করে তেল ভাসছে, আর খোসবু কত দূর ছুটেছে তা 'থ্যাব্ড়াই' বলতে পারে। তার উপর সে কি দৃশ্য—সাদা, লাল, জরদা— এক জায়গায়! আসল ইংরেজি শুয়োরের মাংস, কালো প্রকাণ্ড বঁড়শির চারি ধারে বাঁধা, জলের মধ্যে, রং-বেরঙের গোপীমণ্ডলমধ্যস্থ কৃষ্ণের ন্যায় দোল খাচ্ছে!

এবার সব-চুপ —নোড়ো চোড়ো না, আর দেখো — তাড়াতাড়ি করো না। মোদ্দা— কাছির কাছে কাছে থেকো। ওই বঁড়শির কাছে কাছে ঘুরছে; টোপটা মুখে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখছে! দেখুক। চুপ চুপ — এইবার চিত হল— ওই যে আড়ে গিলছে; চুপ — গিলতে দাও। তখন 'থ্যাবড়া' অবসর-ক্রমে, আড় হয়ে, টোপ উদরস্থ করে যেমন চলে যাবে, অমনি পড়ল টান! বিস্মিত 'থ্যাবড়া' মুখ ঝেড়ে, চাইলে সেটাকে ফেলে দিতে—উলটো উৎপত্তি! বঁড়শি গেল বিঁধে, আর উপরে ছেলে বুড়ো, জোয়ান, দে টান— কাছি ধরে দে টান। ওই হাঙ্গরের মাথাটা জল ছাড়িয়ে উঠল— টান ভাই টান। ওই যে — প্রায় আধখানা হাঙ্গর জলের উপর! বাপ কী মুখ! ও যে সবটাই মুখ আর গলা হে! টান —ওই সবটাই জল ছাড়িয়েছে। ওই যে বঁড়শিটা বিঁধেছে — ঠোঁট এফোঁড় ওফোঁড় — টান। থামথাম — ও আরব পুলিশ-মাঝি, ওর ল্যাজের দিকে একটা দড়ি বেঁধে দাও তো— নইলে যে এত বড়ো জানোয়ার টেনে তোলা দায়। সাবধান হয়ে ভাই, ও-ল্যাজের ঝাপটায় ঘোড়ার ঠ্যাং ভেঙে যায়। আবার টান — কী ভারী হে? ও মা, ও কী? তাই তো হে, হাঙ্গরের পেটের নীচে দিয়ে ও ঝুলছে কী? ও যে নাড়ি-ভুঁড়ি! নিজের ভারে নিজের নাড়ি-ভুঁড়ি বেরোল যে! যাক, ওটা কেটে দাও, জলে পড়ুক, বোঝা কমুক; টান ভাই টান। এ যে রক্তের ফোয়ারা হে! আর কাপড়ের মায়া করলে চলবে না। টান— এই এল। এইবার জাহাজের ওপর ফেলো; ভাই হুঁশিয়ার, খুব হুঁশিয়ার, তেড়ে এক কামড়ে একটা হাত ওয়ার— আর ওই ল্যাজ সাবধান। এইবার, এইবার দড়ি ছাড় — ধুপ! বাবা, কী হাঙ্গর! কী ধপাস করেই জাহাজের উপর পড়ল! সাবধানের মার নেই — ওই কড়িকাঠখানা দিয়ে ওর মাথায় মারো। ওহে ফৌজি-ম্যান, তুমি সেপাই লোক, এ তোমারি কাজ। 'বটে তো'। রক্ত মাখা গায়-কাপড়ে ফৌজি যাত্রী কড়িকাঠ উঠিয়ে দুম দুম দিতে লাগল হাঙ্গরের মাথায় আর মেয়েরা 'আহা কী নিষ্ঠুর! মেরো না' ইত্যাদি চিৎকার করতে লাগল— অথচ দেখতেও ছাড়বে না। তারপর সে বীভৎস কাণ্ড এইখানেই বিরাম হোক। কেমন করে সে হাঙ্গরের পেট চেরা হলে, কেমন রক্তের নদী বইতে লাগল, কেমন সে হাঙ্গর ছিন্ন-অন্ত্র ভিন্ন-দেহ ছিন্নহৃদয় হয়েও কতক্ষণ কাঁপতে লাগল, নড়তে লাগল; কেমন করে তার পেট থেকে অস্থি, চর্ম, মাংস, কাঠ-কুটরো এক রাশ বেরুলো — সেসব কথা থাক। এই পর্যন্ত যে, সেদিন আমার খাওয়া-দাওয়ার দফা মাটি হয়ে গিয়েছিল। সব জিনিসেই সেই হাঙ্গরের গন্ধ বোধ হতে লাগল।

এ সুয়েজ খাল খাতস্থাপত্যের এক অদ্ভুত নিদর্শন। ফর্ডিনেন্ড লেসেপ্স নামক এক ফরাসি স্থপতি এই খাল খনন করেন। ভুমধ্যসাগর আর লোহিতসাগরের সংযাগ হয়ে ইউরোপ আর ভারতবর্ষের মধ্যে ব্যাবসা বাণিজ্যের অত্যন্ত সুবিধা হয়েছে। মানব-জাতির উন্নতির বর্তমান অবস্থার জন্য যতগুলি কারণ প্রাচীনকাল থেকে কাজ করছে, তার মধ্যে বোধ হয় ভারতের বাণিজ্য সর্বপ্রধান। অনাদিকাল হতে, উর্বরতায় আর বাণিজ্য-শিল্পে ভারতের মতো দেশ কি আর আছে? দুনিয়ার যত সুতি কাপড়, তুলা, পাট, নীল, লাক্ষা, চাল, হীরে, মতি ইত্যাদির ব্যবহার ১০০ বৎসর আগে পর্যন্ত ছিল, তা সমস্তই ভারতবর্ষ হতে যেত। তা ছাড়া উৎকৃষ্ট রেশমি পশমিনা কিংখাব ইত্যাদি এদেশের মতো কোথাও হত না। আবার লবঙ্গ এলাচ মরিচ জায়ফল জয়িত্রি প্রভৃতি নানাবিধ মশলার স্থান— ভারতবর্ষ। কাজেই অতি প্রাচীনকাল হতেই যে দেশ যখন সভ্য হত, তখন ওই জিনিসের জন্য ভারতের উপর নির্ভর। এই বাণিজ্য দুটি প্রধান ধারায় চলত; একটি ডাঙাপথে আফগানি ইরানি দেশ হয়ে আর একটি জলপথে রেড-সি হয়ে। সিকন্দর শা ইরান-বিজয়ের পর নিয়ার্কুস নামক সেনাপতিকে জলপথে সিন্ধু নদের মুখ হয়ে সমুদ্র পার হয়ে লোহিতসমুদ্র দিয়ে রাস্তা দেখতে পাঠান। বাবিল ইরান গ্রিস রোম

প্রভৃতি প্রাচীন দেশের ঐশ্বর্য যে কত পরিমাণে ভারতের বাণিজ্যের উপর নির্ভর করত, তা অনেকে জানে না। রোম ধ্বংসের পর মুসলমানি বোগদাদ ও ইতালীয় ভিনিস ও জেনোয়া ভারতীয় বাণিজ্যের প্রধান পাশ্চাত্য কেন্দ্র হয়েছিল। যখন তুর্কেরা রোম সাম্রাজ্য দখল করে ইতালীয়দের ভারত বাণিজ্যের রাস্তা বন্ধ করে দিলে, তখন জেনোয়ানিবাসী কলম্বাস (Christophoro Columbo) আটলান্টিক পার হয়ে ভারতে আসবার নূতন রাস্তা বার করার চেষ্টা করেন, ফল — আমেরিকা মহাদ্বীপের আবষ্ক্রিয়া। আমেরিকায় পৌঁছেও কলম্বাসের ভ্রম যায়নি যে, এ ভারতবর্ষ নয়। সেই জন্যেই আমেরিকায় আদিম নিবাসীরা এখনও 'ইন্ডিয়ান' নামে অভিহিত। বেদে সিন্ধুনদের 'সিন্ধু' 'ইন্দু' দুই নামই পাওয়া যায়; ইরানিরা তাকে 'হিন্দু' গ্রিকরা 'ইন্ডুস' করে তুললে; তাই থেকে ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ান। মুসলমানি ধর্মের অভ্যুদয়ে 'হিন্দু' দাঁড়াল — কালা (খারাপ), যেমন এখন — 'নেটিভ'।

এদিকে পোর্তুগিজরা ভারতের নূতন পথ — আফ্রিকা বেড়ে আবিষ্কার করলে। ভারতের লক্ষ্মী পোর্তুগালের উপর সদয়া হলেন; পরে ফরাসি, ওলন্দাজ, দিনেমার ইংরেজ। ইংরেজের ঘরে ভারতের বাণিজ্য, রাজস্ব— সমস্তই; তাই ইংরেজ এখন সকলের উপর বড়ো জাত। তবে এখন আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ভারতের জিনিসপত্র অনেক স্থলে ভারত অপেক্ষাও উত্তম উৎপন্ন হচ্ছে, তাই ভারতের আর তত কদর নাই। এ কথা ইউরোপীয়েরা স্বীকার করতে চায় না; ভারত — নেটিভপূর্ণ, ভারত যে তাদের ধন, সভ্যতার প্রধান সহায় ও সম্বল, সে কথা মানতে চায় না, বুঝতেও চায় না। আমরাও বোঝাতে কি ছাড়ব? ভেবে দেখো—কথাটা কী? ওই যারা চাষাভূষা তাঁতি-জোলা ভারতের নগণ্য মনুষ্য—বিজাতিবিজিত স্বজাতিনিন্দিত ছোটো জাত, তারাই আবহমানকাল নীরবে কাজ করে যাচ্ছে, তাদের পরিশ্রমফলও তারা পাচ্ছে না! কিন্তু ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক নিয়মে দুনিয়াময় কত পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। দেশ, সভ্যতা, প্রাধান্য ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে।

হে ভারতের শ্রমজীবী! তোমরা নীরব অনবরত-নিন্দিত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ বাবিল, ইরান, আলেকজান্দ্রিয়া, গ্রিস, রোম, ভিনিস, জেনোয়া বোগদাদ, সমরখন্দ, স্পেন, পোর্তুগাল, ফরাসি, দিনেমার, ওলন্দাজ ও ইংরেজের ক্রমান্বয়ে আধিপত্য ও ঐশ্বর্য। আর তুমি? —কে ভাবে এ কথা। স্বামীজি! তোমাদের পিতৃপুরুষ দু-খানা দর্শন লিখেছেন, দশখানা কাব্য বানিয়েছেন, দশটা মন্দির করেছেন — তোমাদের ডাকের চোটে গগন ফাটছে; আর যাদের রুধিরস্রাবে মনুষ্যজাতির যা কিছু উন্নতি— তাদের গুণগান কে করে? লোকজয়ী ধর্মবীর রণবীর কাব্যবীর সকলের চোখের উপর, সকলের পূজ্য; কিন্তু কেউ যেখানে দেখে না, কেউ যেখানে একটা বাহবা দেয় না, যেখানে সকলে ঘৃণা করে, সেখানে বাস করে অপার সহিষ্ণুতা, অনন্ত প্রীতি ও নির্ভীক কার্যকারিতা; আমাদের গরিবরা ঘর দুয়ারে দিনরাত যে মুখ বুজে কর্তব্য করে যাচ্ছে, তাতে কি বীরত্ব নাই? বড়ো কাজ হাতে এলে অনেকেই বীর হয়, দশ হাজার লোকের বাহবার সামনে কাপুরুষও অক্লেশে প্রাণ দেয়, ঘোর স্বার্থপরও নিষ্কাম হয়; কিন্তু অতি ক্ষুদ্র কার্যে সকলের অজান্তেও যিনি সেই নিঃস্বার্থতা, কর্তব্যপরায়ণতা দেখান, তিনিই ধন্য — সে তোমরা ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবী! — তোমাদের প্রণাম করি।

এ সুয়েজ খালও অতি প্রাচীন জিনিস। প্রাচীন মিশরের ফেরো বাদশাহের সময় কতকগুলি লবণাম্বু জলা খাতের দ্বারা সংযুক্ত করে উভয়সমুদ্রস্পর্শী এক খাত তৈয়ার হয়। মিশরে রোমরাজ্যের শাসনকালেও মধ্যে ওই খাত মুক্ত রাখবার চেষ্টা হয়। পরে মুসলমান সেনাপতি অমরু মিশর বিজয় করে ওই খাতের বালুকা-উদ্ধার ও অঙ্গপ্রতঙ্গ বদলে এক প্রকার নূতন করে তোলেন।

তারপর বড়ো কেউ কিছু করেননি। তুরস্ক সুলতানের প্রতিনিধি, মিসর-খেদিব ইস্মায়েল ফরাসিদের পরামর্শে অধিকাংশ ফরাসি অর্থে এই খাত খনন করান। এ খালের মুশকিল হচ্ছে যে, মরুভূমির মধ্য দিয়ে যাবার দরুন পুনঃপুনঃ বালিতে ভরে যায়। এই খাতের মধ্যে বড়ো বাণিজ্য-জাহাজ একখানি একবারে যেতে পারে। শুনেছি যে, অতি বৃহৎ রণতরী বা বাণিজ্য-জাহাজ একেবারেই যেতে পারে না। এখন একখানি জাহাজ যাচ্ছে আরো একখানি আসছে, এ দুয়ের মধ্যে সংঘাত উপস্থিত হতে পারে — এই জন্যে সমস্ত খালটি কতকগুলি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে এবং প্রত্যেক ভাগের দুই মুখে কতকটা স্থান এমনভাবে প্রশস্ত করে দেওয়া আছে, যাতে দুই তিনখানি জাহাজ একত্র থাকতে পারে। ভূমধ্যসাগরমুখে প্রধান আফিস, আর প্রত্যেক বিভাগেই রেল স্টেশনের মতো স্টেশন। সেই প্রধান আফিসে জাহাজটি খালে প্রবেশ করা মাত্রই ক্রমাগত তারে খবর যেতে থাকে। কখানি আসছে, কখানি যাচ্ছে এবং প্রতি মুহূর্তে তারা কে কোথায়— তা খবর যাচ্ছে এবং একটি বড়ো নকশার উপর চিহ্নিত হচ্ছে। একখানির সামনে যদি আর একখানি আসে, এজন্য এক স্টেশনের হুকুম না পেলে আর এক স্টেশন পর্যন্ত জাহাজ যেতে পায় না।

এই সুয়েজ খাল ফরাসিদের হাতে। যদিও খাল-কোম্পানির অধিকাংশ শেয়ার এখন ইংরেজদের, তথাপি সমস্ত কার্য ফরাসিরা করে— এটি রাজনৈতিক মীমাংসা।

স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) : জন্ম কলকাতার সিমুলিয়ায়। প্রথম জীবনে নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। মেধাবী ছাত্র নরেন্দ্রনাথ এফ. এ পড়বার সময় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সান্নিধ্যে আসেন। রামকৃষ্ণদেবের তিরোধানের পর তিনি বরানগরে মঠ স্থাপন করেন ও পরিব্রাজকরূপে সারা ভারত পরিভ্রমণ করেন। সন্ন্যাসজীবনে নাম নেন বিবেকানন্দ। ১৮৯৩ সালে তিনি শিকাগোয় ধর্মমহাসভায় যোগ দিতে যান। দেশে ফিরে তিনি বেলুড়মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রচনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য *প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, পরিব্রাজক, বর্তমান ভারত , ভাববার কথা* প্রভৃতি। বাংলায় 'উদ্বোধন' ও ইংরেজিতে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকা প্রকাশ তাঁর অসামান্য কীর্তি। প্রাঞ্জল গতিশীল তেজোদীপ্ত ভাষা তাঁর গদ্যের বিশেষত্ব।

গালিলিও

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

১৫ ফেব্রুয়ারি ১৫৬৪ গালিলিও পিসা-তে জন্মেছিলেন। সব দেশের বিজ্ঞানীর কাছে এঁর নাম সুপরিচিত। তাঁর জন্মের চারশো বৎসর পরে আজ সব দেশে সভাসমিতিতে তাঁর কথা ও জীবনীর আলোচনা হচ্ছে।

তাঁর পরিবারের নাম ছিল গালিলাই। পিতা পুরাণ-সাহিত্যে কৃতবিদ্য ছিলেন, তাছাড়া সংগীতে ও গণিতে তাঁর দখল ছিল—নিজে Lute ভালো বাজাতে পারতেন। সংগীত তত্ত্বের উপর বইও লিখেছিলেন কয়েকখানি। প্রথমে ১৩ বৎসরের ছেলে গালিলিও গেলেন Vallam-brosa-র বেনেডিকটিন (Benedictine) সম্প্রদায়ের মঠে। দুই বৎসর ধরে সাহিত্য, ন্যায় ও ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করলেন। তবে শেষ অবধি মঠ ছাড়তে হল। বাপ বললেন ছেলের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, বেশি পড়াশোনা ক্ষতিকর। অবশ্য হয়তো মনে মনে একটু ভয়ও ছিল—ছেলে যদি সন্ন্যাসী হয়ে যায়—সংসারের দিকে নজর দিতে কেউ থাকবে না তাঁর পরে। সচ্ছল অবস্থা আর নেই তাঁর। সংসারের হতশ্রীকে পুনরুদ্ধার করতে ছেলেকে চেষ্টা করতে হবে। আজ এখন গালিলিওর জীবনের সব কথা জানা দুষ্কর। তবে আমরা জানি, তিনি নিজে খুবই ভালোবাসতেন সংগীত ও চিত্রকলা। নিজের ইচ্ছা চালাতে পারলে হয়তো শেষ অবধি চিত্রকর হয়ে পড়তেন। তবে তা হল না। ১৫৮১ সালে সতেরো বৎসরে ঢুকলেন পিসা (Pisa) বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তারি পড়তে। অভিভাবক ভেবেছিলেন এতেই অর্থাগমের বিপুল সম্ভাবনা। সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রকে দর্শন পড়তে হত। তখন অ্যারিস্টটলীয় যুগ—সেই গ্রিক দার্শনিকের কথা সকলেই মাথা পেতে নেয় নির্বিচারে। সব জ্ঞান ও বিজ্ঞান শুরু হত ওই মনোভাবকে ভিত্তি করে। গালিলিও-র ঝোঁক কিন্তু অল্প বয়স থেকেই হাতেকলমে করে দেখতে—তাই তর্ক লাগত অন্য ছাত্রদের সঙ্গে। কখনো কখনো শিক্ষকদের সঙ্গেও বেধে যেত বাক্‌যুদ্ধ। যুক্তি তর্কের প্রতি প্রবণতা তাঁর সারা জীবনে লক্ষ করবার জিনিস—এই স্বভাবই শেষ জীবনে তাঁর অশেষ দুঃখের কারণ হল। এই কাজ-পাগল কী করে বিশুদ্ধ গণিতের দিকে ঝুঁকল? গল্প এই —পরিবারের এক বন্ধু ছিলেন গণিতশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত। তিনি বিখ্যাত ছিলেন সে সময়—সকলে যেত তাঁর কাছে পড়তে। একদিন কোনো কাজে গালিলিও এসেছেন তাঁর বাড়িতে। তাসকানির (Tuscany) শাসকের পুত্র তখন সেই পণ্ডিতের কাছে পড়ছে। কাজেই গালিলিও অনেকক্ষণ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন, অনেকক্ষণ মনোযোগ দিয়ে শুনলেন সেই গণিতের ব্যাখ্যা। এই থেকে শুরু হল মনের প্রচণ্ড পরিবর্তন। সেই থেকে ডাক্তারি পড়ায় আনন্দ পান না। গণিতের অধ্যয়ন বাসনাই প্রবল হয়ে উঠল, গালিলিওর ডাক্তারি পড়া হল না। বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি আর পেলেন না। পারিবারিক নানা কারণে গৃহস্থালী ফ্লোরেন্সে (Florence) উঠে এল। বাবার অর্থ সামর্থ্য নেই ছেলেকে বিদেশে রেখে পড়ান। কাজেই গালিলিও চলে এলেন ফ্লোরেন্সে। এখানে সেই সভাপণ্ডিতের কাছে পড়তে শুরু করেলেন—গণিত ও পদার্থবিদ্যা। অদ্ভুত তাঁর অধ্যবসায়। অল্প সময়ের মধ্যেই শিক্ষককে

ফেলে গেলেন অনেক পিছনে। এই বিদ্যায় ও অনুসন্ধানে প্রতিষ্ঠা এল—নানা দেশে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। ২৪ বৎসর বয়সে তিনি এই নিয়ে মেতে আছেন, উদ্ভাবন করছেন নানারকমের যন্ত্র এবং নানারকম পরীক্ষাও শুরু হয়েছে তাদের সাহায্যে। নবীন বিজ্ঞানীকে প্রথমে ভুগতে হয়েছিল অর্থকষ্টের জন্যে। ছেলে পড়িয়ে রোজগারের চেষ্টা ছিল, কিন্তু তাতে অল্পই আয় হত সে সময়। তবে ১৫৮৮ সালে দেখি, 'পিসা' বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের শিক্ষকতা করছেন। আয় মাত্র ৬০ Scudi। একজন হিসাব করে বলেছেন—বর্তমানের হিসাবে এটা ৯০০-১০০০ টাকা বাৎসরিক আয়ের সামিল হবে। এতে পরিবারের সব খরচ চালানো দুষ্কর। তখন এদেশের মতো ইটালিতে একান্নবর্তী পরিবারের যুগ। বাপ আবার মারা গেলেন ১৫৯১সালে। গালিলিও হলেন কর্তা। সকলের ভার বইতে হল—মা, দুই বোন। ছোটো ভাই মাইকেল এঞ্জেলো (Michael-Angelo) (ইনি বোধহয় গান-বাজনা নিয়েই সময় কাটাতেন) বিদেশে চলে গেলেন এবং পোল্যান্ডে রাজদরবারে কলাবিদ্ হলেন। বাড়িতে—ফ্লোরেন্সে রয়ে গেল তাঁর স্ত্রী ও সাতটি ছেলে-মেয়ে। গালিলিওকে তাঁদেরও দেখতে হত। এই জন্য সারাজীবন দেখা যায় গালিলিও একদিকে যেমন মহানুভব, পরের কথা ভাবছেন—অপরদিকে চাইছেন, কী করে তাঁর প্রচুর অর্থাগম হয়। তার জন্যে করতে চাইছেন ব্যবসা, নানা স্থানে উমেদারি করছেন—ছুটাছুটি করছেন ও কর্মস্থল পরিবর্তন করছেন। যদিও মন তাঁর ফ্লোরেন্সকেই ভালোবেসেছিল। সেখানেই তিনি থাকতে চাইতেন সারাজীবন। ফ্লোরেন্সকে যে জানে, সেই বুঝবে তাঁর শিল্পী মন ওই মহিমাময়ী নগরীর প্রতি কেন এত বেশি আকৃষ্ট ছিল।

পিতার মৃত্যুর পর সংসারে অনটন বাড়ল। তখন ১৫৯২ সালে এলেন পাডুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মাতৃভূমি তাসকানি ছেড়ে। এখানেই শুরু হল তাঁর প্রকৃত বিজ্ঞানীর জীবন। তবে চাপও পড়ল খুব বেশি—বিদ্যালয়ের অধ্যাপনা তো আছেই, তাছাড়া দেশ রক্ষার নানা ব্যাপারে পরামর্শদাতা হয়ে উঠলেন। আবার ফ্লোরেন্সকেও ভুলতে পারলেন না। ফ্লোরেন্সে আসতেন প্রতি গ্রীষ্মের ছুটিতে। এখানকার Duke-এর ছেলে Cosmo তাঁর প্রিয় ছাত্র। তাঁর মা আবার বিশ্বাস করতেন ফলিত জ্যোতিষে—রাশিচক্র কেটে ভবিষ্যৎ গণনায়। তাঁর মন জুগিয়ে তাও করতেন গালিলিও সময় সময়। যদিও এতে তিনি নিজে বিশ্বাস করতেন কিনা বলা শক্ত। নিজে কোপারনিকাসের বিশ্ববিন্যাসে গভীর বিশ্বাসী। অবশ্য তখনও সর্বত্র টলেমির যুগ চলছে। ফলিত জ্যোতিষের রাশিচক্র গ্রহণক্ষত্র সবই অচল পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে—এই পরিবেশে গ্রহদের অবস্থান নিয়েই জ্যোতিষের বিচার ও গণনা টলেমীয় পন্থায় করতে হয়। এদিকে গালিলিও নতুন মতবাদ নিয়ে মেতে আছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাডুয়ায় বক্তৃতা দিচ্ছেন—কোপারনিকাসের মতবাদের পক্ষে। প্রচুর লোক শুনতে আসছে এই সব মনোজ্ঞ বক্তৃতা।

দেখতে দেখতে কেটে গেল ১৮ বৎসর একই বিশ্ববিদ্যালয়ে। Venice-এর সরকার তাঁর উপর খুশি। ১৬০৪ সনে আরও ৬ বৎসরের মেয়াদ বাড়ল শিক্ষকতার। এই সময় তাঁর বৈপ্লবিক মতবাদের বিপক্ষে কেউ আপত্তি জানাল না।

১৬০৯ সালে ঘটল এক নতুন ব্যাপার—হল্যান্ডে একজন কাচের লেন্স নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ একটি নলের দু-পাশে রেখে দেখলেন, দূরের জিনিস এভাবে বড়ো দেখায়—মনে হয় কাছে এগিয়ে এসেছে। গালিলিওর কাছে এই খবর পৌঁছাল। তিনি কাগজে প্ল্যান এঁকে আলোর রেখাপথের বিষয় বিচার করতে লাগলেন। শীঘ্রই এই সমস্যার সমাধান হল। তিনিও দূরবিন তৈরি করতে পারলেন—এটি আরও ভালো ও শক্তিশালী হল। হল্যান্ডে লোকটি দেখছিল—সব উল্টো দেখায় তাঁর দূরবিনে। গালিলিও করলেন যে

যন্ত্র, তার সাহায্যে সব জিনিস যথারীতি অবস্থিত দেখায়, উল্টোপাল্টা হয় না। Venice-এ কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁর কদর বেড়ে গেল। সমুদ্রপথে Venice-এর নৌবাহিনী তখন ঘুরে বেড়ায়, নানা দেশ থেকে পণ্য সংগ্রহ করে এনে ইউরোপে নানা স্থানে বেচা-কেনা করে—বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী। রূপকথার স্বপ্নপুরীর মতো তখন Venice শহরের সম্পদ। মধ্যে মধ্যে এর নৌবহরকে শত্রুপক্ষের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে হত। আগে থেকে শত্রুকে দেখা গেলে যুদ্ধের প্রস্তুতি যথাসময়ে করা সম্ভব। তাই কর্তৃপক্ষ ভাবলেন—এই দূরবিন সব জাহাজেই বসাতে হবে। গালিলিওর উপর ভার পড়ল-দূরবিন জোগান দেবার। গালিলিও রাজি হলেন—বাড়ি হয়ে উঠল ফ্যাক্টরি কারুশালা। সেখান থেকে প্রচুর দূরবিন বিক্রি হতে লাগল। তৈরির সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রেরও নানা উন্নতি হল। নতুনগুলি হল আগের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। এবার গালিলিও পেলেন হাতের মধ্যে বিশ্বসমীক্ষার এক প্রধান যন্ত্র। আকাশের দিকে ফিরিয়ে গালিলিও অনেক নতুন দৃশ্য দেখলেন। তাঁর আগে এসব মানুষের কল্পনার অতীত ছিল। চাঁদের পাহাড়, ছায়াপথের মধ্যে লক্ষ লক্ষ তারার সমাবেশ চোখে ধরা পড়ল, আবার এল নতুন নতুন উপগ্রহের খবর। আমাদের পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে একটি মাত্র চন্দ্রমা। গালিলিও দেখলেন বৃহস্পতি গ্রহের ৪টি উপগ্রহ ঘুরছে। তখনকার দিনে ধার্মিক পণ্ডিতেরা এসব বিশ্বাস করতে চাইলেন না। তাঁরা ভাবলেন—এইভাবে কোপারনিকাসের বিশ্ববিন্যাসের স্বপক্ষে যুক্তি সংগ্রহ করে গালিলিও অন্যায় করছেন। দূরবিনের মধ্যে কোন জাদুর বলে বৃহস্পতির চাঁদের ছবি পড়েছে, যা চোখে দেখা যায় না—তা যন্ত্রে প্রতিপন্ন হলে সেটা যন্ত্রেরই কারসাজি। ধার্মিকেরা মত পরিবর্তন করলেন না ও পাছে তাঁদের বিশ্বাস টলে যায়, এই ভয়ে দূরবিনের ভিতর দিয়ে দেখতেও চাইলেন না। এতে গালিলিওর আমোদ লাগল। একজন উচ্চপদস্থ ধর্মযাজক, যিনি দূরবিনের ব্যবহার করতে চাননি, কাজেই বৃহস্পতির উপগ্রহে অবিশ্বাসী ছিলেন, মারা গেলেন। সেই সময়ে গালিলিও রহস্য করে বললেন—হয়তো এবার যাবার সময় 'চন্দ্রগুলি' দেখতে পাবেন। গালিলিওর নাম তখন দেশে দেশে অভিনন্দিত হচ্ছে। Venice-এর রাজ সরকারের কাছ থেকে অর্থও পাচ্ছেন প্রচুর। তবে এত কাজের মধ্যে বিজ্ঞানীর অবসর মেলে না। অথচ মাথার মধ্যে অনেক নতুন নতুন কথা ভেসে উঠছে—নানা বিষয়ে অনুসন্ধান করতে চান, কিন্তু সময় পান না একাগ্র মনে এইসব বিষয় ভাবতে। অথচ সংসারে তাঁর প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। তাই ১৬০৯ সালে যখন Tuscany-র বৃদ্ধ ডিউক মারা গেলেন ও তাঁর ছাত্র Cosmo সেই গদিতে বসলেন, তখন তিনি ভাবলেন হয়তো এঁর কাছে যেতে পারলে তিনি আকাঙ্ক্ষিত অবসর পাবেন নিজের কাজ করতে, অথচ অর্থেরও কোনো অভাব থাকবে না। তাই ভিতরে ভিতরে চেষ্টা করতে লাগলেন দরবার করতে নতুন ডিউকের কাছে। এই সময় ফ্লোরেন্সের এক বন্ধুকে লেখা চিঠির থেকে কয়েক লাইনের সারাংশ উদ্ধৃত হল :

'এখান থেকে অন্য কোথাও গেলে যে বেশি অবসর পাব নিজের কাজ করতে, তা মনে হয় না। কারণ বক্তৃতা দিয়েই পয়সা রোজগার করতে হবে সংসার চালাতে। পাড়ুয়া ছাড়া অন্য কোনো শহরে গিয়ে অধ্যাপনা করতে ইচ্ছাও হয় না নানা কারণে। অথচ অবসর না পেলে কাজও এগোবে না।

ভিনিসে গণতন্ত্র—যতই এরা উদার বা মহানুভব হোক, বাঁধা কর্তব্য করা ছাড়া এদের কাছে বৃত্তি আশা করা বৃথা। যতদিন পারি এই গণতন্ত্রে বক্তৃতা ও লেখাপড়া চালাতে হবে—যা এখানকার লোকেরা চায়। মাইনে পেলে আর অবসর মিলবে না; অর্থাৎ যে অবসর ও অর্থানুকূল্য আমি চাইছি, সে কোনো এক দেশের স্বতন্ত্র রাজার কাছ থেকেই পাওয়া সম্ভব।'

আবার অন্যত্র লিখেছেন—'রোজ রোজ নানা উদ্ভাবন করা যাচ্ছে। অবসর ও সাহায্য পেলে অনেক বেশি পরীক্ষা ও আবিষ্কার করতে পারব।'

এক বৎসর ধরে এই ধরনের কথাবার্তা চালালেন রাজার বিশ্বস্ত মন্ত্রী ও কর্মচারীদের সঙ্গে। শেষে ১৬১০ সালে শরৎকালে Tuscany-এর নতুন Grand Duke নিজের পুরোনো গুরুকে আশ্রয় দিলেন—১০০০ Scudy মাইনে প্রতি বৎসর। তাছাড়া রাজপণ্ডিত ও দার্শনিক হিসাবে স্বর্ণপদকে বিভূষিত হলেন তিনি। পাড়ুয়া ছেড়ে ফ্লোরেন্সে গেলেন গালিলিও।

এবার বিজ্ঞান সেবার প্রচুর অবসর মিলল। তবে যেসব নতুন কথা বললেন, বিশেষ করে জ্যোতিষের বিষয়, তাতে ইউরোপের পণ্ডিতমহলে হইচই বেঁধে গেল। অনেকে তাঁর বিরুদ্ধতা করতে লাগলেন। তাছাড়া আর এক কারণে তাঁর সব আবিষ্কার ও মতামত শুধু পণ্ডিতমহলে আবদ্ধ রইল না। শিক্ষিত জনসাধারণের কাছে প্রচারের জন্য গালিলিও ধরলেন এক নতুন পন্থা। পণ্ডিতমহলে চালু Latin ছেড়ে লিখতে আরম্ভ করলেন—নিজের আবিষ্কার ও মতবাদ—ইটালিয়ান ভাষায়। ইটালির মধ্যে যাদের অক্ষর পরিচয় হয়েছে, এমন সব লোকই যাতে পড়তে পারে। ১৬১২ সালের মে মাসে তিনি চিঠিতে লিখলেন :

'আমি দেখি যুবকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছে—হচ্ছে ডাক্তার, দার্শনিক বা অন্য কিছু—যাহোক একটা উপাধি হলেই হল। তারপর এমন কাজে তারা নামে, যার জন্যে তারা একেবারেই অপটু। এদিকে যারা সত্য-সত্যই উপযুক্ত লোক, তারা কাজের মধ্যে থেকে কিংবা দৈনিক দুশ্চিন্তার মধ্যে আর জ্ঞানের চর্চা করতে পারে না। এরা মেধাবী, কিন্তু তাঁরা সাধুভাষা (Latin) ইত্যাদি বোঝে না। তাই সারাজীবন তাঁদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল থেকে যায় যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বই এমন সব মহামূল্য জ্ঞানের ভাণ্ডার, যা তাদের কাছে একেবারে অবরুদ্ধ হয়ে থাকবে। কিন্তু আমি চাই তাঁদের মধ্যে এই সত্য জ্ঞানের উদ্বোধন করতে যে, বিশ্বপ্রকৃতি সকল মানুষকে চোখ দিয়েছেন তাঁর ক্রিয়াকলাপ দেখতে ও বুদ্ধি দিয়েছেন যাতে তাঁর মর্মকথা সকলে বুঝতে পারে ও নিজেদের কাজে লাগাতে পারে।'

নিজের দূরবিন নিয়ে গালিলিও অনেক নতুন আবিষ্কার করলেন। চাঁদের পর্বতমালা, বৃহস্পতির উপগ্রহসমূহ, সূর্যবিম্বে কলঙ্কবিন্দু, শুক্র গ্রহের চন্দ্রের মতো ঔজ্জ্বল্যের হ্রাসবৃদ্ধি, শনির বলয় ইত্যাদি আরও অনেক জিনিস। এইভাবে নিজের চোখে গ্রহমণ্ডলের অনেক বৈশিষ্ট্য দেখতে পেলেন, যার সত্যতা যে কেউ দূরবিনের সাহায্যে নিরূপণ করতে পারবে। কোপারনিকাসের মতবাদ তাঁর কাছে অভ্রান্ত মনে হল। যুক্তিবাদী গালিলিও ভাবলেন, এইসব কথা প্রকাশ করলে সকলকেই তাঁর স্বপক্ষে আনতে পারবেন। তাই সে বিষয়ে বইও লিখলেন তিনি। তা সত্ত্বেও সনাতনীরা কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধতা করতে লাগলেন। একদিকে ফ্লোরেন্সের ডোমিনিকান সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা, অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা অধ্যাপক ও ছাত্রেরা, যাঁরা এইসব নতুন মত মানতে পারলেন না কিংবা যাঁরা তাঁর যশোপ্রতিভায় ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠলেন। প্রথম প্রথম গালিলিও তাঁর সহকর্মীদের মনোভাব নিয়ে অনেক ঠাট্টা-তামাসা করতেন, এতে তাদের বিদ্বেষ আরও বাড়ল। ধর্মযাজকেরা প্রচার করতে লাগলেন যে, গালিলিওর অধ্যাপনা ধর্মবিশ্বাসের পরিপন্থী, বাইবেলের অনেক কথার সরাসরি বিরুদ্ধে। তাঁরা গোপনে অভিযোগ করলেন—গালিলিও ধর্ম-বিদ্বেষ প্রচার করছেন; বাইবেলের উপর মানুষের বিশ্বাস নষ্ট করতে চাইছেন।

তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র গোপনে কাজ আরম্ভ করল। প্রথমে Inquisition রায় দিলেন যে, সূর্য যে জগতের কেন্দ্র স্বরূপ—এটি অযৌক্তিক এবং যথার্থ ধর্মমতের পরিপন্থী—কারণ এই মত বাইবেলের অনেক লেখার সঙ্গে মিলবে না, যা এতকাল ধার্মিক যাজক ও পণ্ডিতেরা শিক্ষা দিয়ে এসেছেন। সঙ্গে সঙ্গে এই সিদ্ধান্তও প্রকাশ করলেন—পৃথিবীর আহ্নিক বা বার্ষিক গতির ধারণা প্রকৃত ধর্মবিশ্বাসের বিরোধী। ১৬১৬ সালে মার্চ মাসে কোপারনিকাসের বই ও তৎসম্পর্কিত আরও দুইটি বইয়ের প্রচার তাঁরা নিষিদ্ধ করে দিলেন এবং পুণ্যাত্মা পোপের কাছে এই খবর পৌঁছে দিলেন।

পোপ আদেশ দিলেন কার্ডিনাল বেলারিমিন যেন গালিলিওকে ডেকে বুঝিয়ে বলেন—তিনি যেন এই ভ্রান্ত বিশ্বাস ত্যাগ করেন, আর তা যদি তিনি না করতে চান তো বিধিমতো তাঁকে আদেশ দেওয়া হবে, যাতে তিনি এই মত প্রচার বা আলোচনা বন্ধ করেন। যদি তাতে তিনি অস্বীকৃত হন তো তাকে কারারুদ্ধ করা হবে। ১৬১৬ সালে গালিলিওর রোমে ডাক পড়ল। বেলারিমিন ছিলেন গালিলিওর হিতাকাঙ্ক্ষী ও সুহৃদ। জ্যোতিষ শাস্ত্র ছাড়াও অন্যান্য আবিষ্কারে গালিলিও তখন নাম করেছেন। জলে ভাসমান বস্তুর স্থিতিসাম্যের বিষয়ে ভাবছেন। আবার গতিবিজ্ঞানে অনেক নতুন কথাও তিনি বলতে আরম্ভ করেছেন, সেই সময় থেকেই। তাই কার্ডিনাল বেলারিমিন ডেকে আনলেন গালিলিওকে নিজের প্রাসাদে। বুঝিয়ে বললেন—কোপারনিকাসের তত্ত্ব নিয়ে তিনি যেন ধর্মপ্রচারকদের সঙ্গে তর্ক না করেন বা বাইবেল থেকে লাইন উদ্ধৃত করে নিজের মত ও তার ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা না করেন। গালিলিও রাজি হলেন, তবে তিনি ভাবলেন এখনো গণিতের কল্পনা হিসাবে হয়তো কোপারনিকাসের কথা আলোচনা করা যাবে কিংবা যুক্তি তর্ক দিয়ে টলেমি ও কোপারনিকাসের বিশ্ববিন্যাসের গুণাগুণ আলোচনা চলতে পারবে। তাই তার পরও তিনি যেমন অন্যান্য বিজ্ঞানের বই লিখলেন, গতির কথা বা ভাসমান বস্তুর স্থিতিরহস্য—সঙ্গে সঙ্গে কথোপকথনের আকারে দুই মতবাদের আলোচনা করে বই লিখে ছাপাবার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক কিছু ঘটে গিয়েছে। পোপ ও বেলারিমিন মারা গিয়েছেন। নতুন আর একজন পোপের পদে অধিষ্ঠিত। এক সময়ে গালিলিও ভাবতেন—ইনি বিজ্ঞানকে শ্রদ্ধা করেন, তাই ভেবেছিলেন নতুন বই প্রকাশে অনুমতি মিলবে। কিন্তু হল হিতে বিপরীত, নানা কারণে তিনি নতুন পোপের বিরাগভাজন হয়েছেন। তাঁর বিষয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। শেষে গালিলিওর ডাক পড়ল—১২ এপ্রিল তিনি কারারুদ্ধ হলেন। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করা নিষিদ্ধ হয়ে গেল। ৩০ এপ্রিল গালিলিওকে স্বীকার করানো হল যে, যা কিছু তিনি এই বিষয়ে কথোপকথনের ছলে লিখেছেন— সে সবই তাঁর বৃথা গর্বের অজ্ঞতা ও অসতর্কতার নিদর্শন। তাঁর নির্যাতনের এইখানেই শেষ হল না। তাঁর মুখ দিয়ে বলানো হল যে, তিনি কোপারনিকাসের মতে বিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বিচারকদের সামনে অনুতাপব্যঞ্জক সাদা পোশাক পরে তিনি হাঁটু গেড়ে রইলেন। বিচারকেরা বললেন—'তোমার ভুল দেশের ভয়ানক অমঙ্গল করেছে। তার শাস্তি তোমায় পেতে হবে, তোমার বই নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হবে। আমাদের আদেশে তোমাকে কারারুদ্ধ থাকতে হবে যতদিন আমরা তোমাকে রাখতে চাই, তাছাড়া তিন বৎসর ধরে প্রতি সপ্তাহে তোমাকে অনুতাপসূচক প্রার্থনা করতে হবে।' এর দুদিন বাদে Inquisition তাঁকে ফ্লোরেন্সের দূতাবাসে প্রেরণ করলেন। প্রথমে তাঁকে সিয়েনাতে (Siana) Archbishop-এর নজরবন্দী করে রাখা হল। তার পর ফ্লোরেন্সের শহরতলিতে নিজের গৃহে অন্তরীণ রইলেন।

দুঃখে-কষ্টে গালিলিওর জীবনের শেষ ৯ বৎসর কাটল। তখনও বিজ্ঞানের নতুন কথা ভাবতে চেষ্টা করতেন বটে, কিন্তু জীবন বিস্বাদ হয়ে গেছে। যে মেয়ে তাঁর পরিচর্যা করত এই দুঃখকষ্টের মধ্যে সেও মারা গেল। নিজে অন্ধ হয়ে যেতে বসলেন। শেষের পাঁচ বৎসর একটু বন্ধন ঢিলে হল—কিছুটা বাধানিষেধের হাত

থেকে অব্যাহতি পেলেন পোপের করুণায়—নানা দেশ থেকে তখন তাঁকে দেখতে আসত, তাঁর বই ও লেখা অবৈধ ভাবে অন্য দেশে চালান ও ছাপা হয়েছে। খ্যাতি ও সহানুভূতি ছিল সেই খ্রিস্টীয় মহলে, যাঁরা রোমান ক্যাথলিক ধর্মপন্থী ছিলেন না। সর্বশেষে ৮ জানুয়ারি ১৬৪২ সালে ৭৭ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করলেন।

প্রবাদ আছে যে, Inquisition বিচারকদের সামনে হাঁটু-গাড়া থেকে যখন তিনি দাঁড়িয়ে উঠলেন—তখন নাকি তিনি বলেছিলেন— 'এ সত্ত্বেও পৃথিবী চলমান।' কিন্তু এটা হয়ত গল্প কথা। সনাতনী ধার্মিকেরা বিজ্ঞানের শ্বাসরুদ্ধ করবার চেষ্টা করেছিলেন যথারীতি। ফলে ইটালি দেশই পিছিয়ে পড়ল। ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও অন্যান্য দেশে গালিলিওর আজন্ম সাধনা সুফল প্রসব করল।

গালিলিও প্রথমে সনাতনী ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানের পরীক্ষিত সত্য প্রচার করতে চেষ্টা করেছিলেন। বলেছিলেন নিজে পরীক্ষা, বিচার ও যাচাই করে নিতে হবে সব সত্যকে—শুধু আপ্তবাক্যকে বিশ্বাস করে জীবনকে গড়ে তুললে ভুল হবে। ফলে তিনি কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতার যাঁতায় গুঁড়ো হয়ে গেলেন। তবে মানুষের অগ্রগতি স্তব্ধ রইল না।

চারশত বৎসর বাদেও তাঁর প্রতি নানা লোকের ভক্তির অর্ঘ্য সেই সত্যের জয় ঘোষণা করছে। 'সত্যমেব জয়তে'।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৮৯৪-১৯৭৪) : জন্ম কলকাতায়। বিশ্ববিখ্যাত পদার্থতত্ত্ববিদ। পরমাণুবিজ্ঞানে তাঁর অবদান সারা বিশ্বে স্বীকৃত। আলবার্ট আইনস্টাইনের সঙ্গে তাঁর সংযোগে উদ্ভূত হয়েছে 'বোস-আইনস্টাইন স্ট্যাটিস্টিক্স্'। পদ্মবিভূষণ সম্মানে ভূষিত সত্যেন্দ্রনাথ সারাজীবন বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও অধ্যাপনা করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাহিত্যচর্চাও করেছেন। তিনি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার প্রসারে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তিনি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'পরিচয়' গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। *শিক্ষা ও বিজ্ঞান, শিল্প ও বিজ্ঞান, দেশবিদেশের বেতার চর্চা, বিজ্ঞানের সংকট* প্রভৃতি বিজ্ঞানভিত্তিক প্রবন্ধ রচনার পাশাপাশি *ছোটো রুটির গোলা* কিংবা *জাহাজডুবি*'র মতো সুখপাঠ্য ছোটোগল্প রচনা করেন।

ক বি তা

নীলধ্বজের প্রতি জনা

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

একাদশ সর্গ

[মাহেশ্বরী পুরীর যুবরাজ প্রবীর অশ্বমেধ-যজ্ঞাশ্ব ধরিলে,—পার্থ তাহাকে রণে নিহত করেন। নীলধ্বজ রায় পার্থের সহিত বিবাদপরাঙ্মুখ হইয়া সন্ধি করাতে, রাজ্ঞী জনা পুত্রশোকে একান্ত কাতর হইয়া এই নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি রাজসমীপে প্রেরণ করেন। পাঠকবর্গ মহাভারতীয় অশ্বমেধ পর্ব পাঠ করিলে ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবেন।]

বাজিছে রাজ-তোরণে রণবাদ্য আজি;
হ্রেষে অশ্ব, গর্জে গজ, উড়িছে আকাশে
রাজকেতু! মুহুর্মুহুঃ হুঙ্কারিছে মাতি
রণমদে রাজসৈন্য!—কিন্তু কোন্ হেতু?
সাজিছ কি, নররাজ, যুঝিতে সদলে—
প্রবীর পুত্রের মৃত্যু প্রতিবিধিৎসিতে,—
নিবাইতে এ শোকাগ্নি ফাল্গুনীর লোহে?
এই তো সাজে তোমারে, ক্ষত্রমণি তুমি,
মহাবাহু! যাও বেগে গজরাজ যথা
যমদণ্ডসম শুণ্ড আস্ফালি-নিনাদে!
টুট কিরীটির গর্ব আজি রণস্থলে!
খণ্ডমুণ্ড তার আন শূলদণ্ড-শিরে!
অন্যায় সমরে মূঢ় নাশিল বালকে।
নাশ, মহেষ্বাস, তারে! ভুলিব এ জ্বালা,
এ বিষম জ্বালা, দেব, ভুলিব সত্বরে।
জন্মে মৃত্যু,—বিধাতার এ বিধি জগতে।
ক্ষত্রকুল-রত্ন পুত্র প্রবীর সুমতি,
সম্মুখ-সমরে পড়ি, গেছে স্বর্গধামে,—
কি কাজ বিলাপে, প্রভু? পাল মহীপাল,
ক্ষত্রধর্ম, ক্ষত্রকর্ম সাধ ভুজবলে।

হায়, পাগলিনী জনা! তব সভামাঝে
নাচিছে নর্তকী আজি, গায়ক গাইছে,
উথলিছে বীণাধ্বনি! তব সিংহাসনে
বসিছে পুত্রহা রিপু—মিত্রোত্তম এবে!
সেবিছ যতনে তুমি অতিথি-রতনে।—
কি লজ্জা! দুঃখের কথা, হায় কব কারে?
হতজ্ঞান আজি কি হে পুত্রের বিহনে,
মাহেশ্বরী-পুরীশ্বর নীলধ্বজ রথী?
যে দারুণ বিধি, রাজা, আঁধারিলা আজি
রাজ্য, হরি পুত্রধনে, হরিলা কি তিনি
জ্ঞান তব? তা না হলে, কহ মোরে কেন
এ পাষণ্ড পাণ্ডুরথী পার্থ তব পুরে
অতিথি? কেমন তুমি, হায়, মিত্রভাবে
পরশ সে কর, যাহা প্রবীরের লোহে
লোহিত? ক্ষত্রিয়ধর্ম এই কি, নৃমণি?
কোথা ধনুঃ, কোথা তূণ, কোথা চর্ম অসি?
না ভেদি রিপুর বক্ষঃ তীক্ষ্ণ তম সরে
রণক্ষেত্রে, মিষ্টালাপে তুষিছ কি তুমি
কর্ণ তার সভাতলে? কি কহিবে, কহ,—
যবে দেশ-দেশান্তরে জনরব লবে

এ কাহিনি,—কি কহিবে ক্ষত্রপতি যত?
নরনারায়ণ-জ্ঞানে, শুনিনু, পূজিছ
পার্থে, রাজা, ভক্তি ভাবে;—এ কি ভ্রান্তি তব?
হায়, ভোজবালা কুন্তী—কে না জানে তারে,
স্বৈরিণী? তনয় তার জারজ অর্জুনে
(কি লজ্জা,) কি গুণে তুমি পূজ রাজরথি,
নরনারায়ণ-জ্ঞানে? রে দারুণ বিধি,
এ কি লীলাখেলা তোর, বুঝিব কেমনে?
একমাত্র পুত্র দিয়া নিলি পুনঃ তারে
অকালে! আছিল মান,— তাও কি নাশিলি?
নরনারায়ণ পার্থ? কুলটা যে নারী—
বেশ্যা—গর্ভে তার কি হে জনমিলা আসি
হৃষীকেশ? কোন্ শাস্ত্রে, কোন্ বেদে লেখে—
কি পুরাণে—এ কাহিনি? দ্বৈপায়ন ঋষি
পাণ্ডব-কীর্তন গান গায়েন সতত।
সত্যবতীসূত ব্যাস বিখ্যাত জগতে।
ধীবর জননী, পিতা ব্রাহ্মণ! করিলা
কামকেলি লয়ে কোলে ভ্রাতৃবধূদ্বয়ে,
ধর্মমতি! কি দেখিয়া, বুঝাও দাসীরে
গ্রাহ্য কর তাঁর কথা, কুলাচার্য তিনি
কু-কুলের? তবে যদি অবতীর্ণ ভবে
পার্থরূপে পীতাম্বর, কোথা পদ্মালয়া
ইন্দিরা? দ্রৌপদী বুঝি? আঃ মরি, কি সতী!
শাশড়ির যোগ্য বধূ! পৌরব-সরসে
নলিনী! অলির সখী, রবির অধীনী,
সমীরণ-প্রিয়া! ধিক্! হাসি আসে মুখে,
(হেন দুঃখে) ভাবি যদি পাঞ্চালীর কথা!
লোক-মাতা রমা কি হে এ ভ্রষ্টা রমণী?
জানি আমি কহে লোক রথিকুল-পতি
পার্থ। মিথ্যা কথা, নাথ! বিবেচনা কর,
সূক্ষ্ম বিবেচক তুমি বিখ্যাত জগতে।—
ছদ্মবেশে লক্ষ রাজে ছলিল দুর্মতি
স্বয়ম্বরে। যথাসাধ্য কে যুঝিল, কহ,
ব্রাহ্মণ ভাবিয়া তারে, কোন্ ক্ষত্ররথী,
সে সংগ্রামে? রাজদলে তেঁই সে জিতিল
দহিল খাণ্ডব দুষ্ট কৃষ্ণের সহায়ে।
শিখণ্ডীর সহকারে কুরুক্ষেত্র রণে
পৌরব-গৌরব ভীষ্ম বৃদ্ধ পিতামহে
সংহারিল মহাপাপী! দ্রোণাচার্য গুরু,—
কি কুছলে নরাধম বধিল তাঁহারে,
দেখ স্মরি? বসুন্ধরা গ্রাসিলা সরোষে
রথচক্র যবে, হায়; যবে ব্রহ্মশাপে
বিকল সমরে, মরি কর্ণ মহাযশাঃ,
নাশিল বর্বর তাঁরে। কহ মোরে, শুনি,
মহারথী-প্রথা কি হে এই, মহারথি?
আনায়-মাঝারে আনি মৃগেন্দ্রে কৌশলে
বধে ভীরুচিত ব্যাধ, সে মৃগেন্দ্র যবে
নাশে রিপু, আক্রমে সে নিজ পরাক্রমে!
কি না তুমি জান রাজা? কি কব তোমারে?
জানিয়া শুনিয়া তবে কি ছলনে ভুল
আত্মশ্লাঘা, মহারথি? হায় রে কি পাপে,
রাজ-শিরোমণি রাজা নীলধ্বজ আজি
নতশির,—হে বিধাতঃ!—পার্থের সমীপে?
কোথা বীরদর্প তব? মানদর্প কোথা?
চণ্ডালের পদধূলি ব্রাহ্মণের ভালে?
কুরঙ্গীর অশ্রুবারি নিবায় কি কভু
দাবানলে? কোকিলের কাকলী-লহরী
উচ্চনাদী প্রভঞ্জনে নীরবয়ে কবে?
ভীরুতার সাধনা কি মানে বলবাহু?
কিন্তু বৃথা এ গঞ্জনা। গুরুজন তুমি;
পড়িব বিষম পাপে গঞ্জিলে তোমারে।
কুলনারী আমি, নাথ, বিধির বিধানে
পরাধীন! নাহি শক্তি মিটাই স্ববলে
এ পোড়া মনের বাঞ্ছা! দুরন্ত ফাল্গুনী
(এ কৌন্তেয়-যোধে ধাতা সৃজিলা নাশিতে
বিশ্বসুখ!) নিঃসন্তানা করিল আমারে!
তুমি পতি, ভাগ্যদোষে বাম মম প্রতি
তুমি! কোন সাধে প্রাণ ধরি ধরাধামে?
হায় রে, এ জনাকীর্ণ ভবস্থল আজি

বিজন জনার পক্ষে! এ পোড়া ললাটে
লিখিলা বিধাতা যাহা, ফলিল তা কালে!—
হা প্রবীর! এই হেতু ধরিনু কি তোরে,
দশ মাস দশ দিন, নানান যত্ন সয়ে,
এ উদরে? কোন্ জন্মে কোন্ পাপে পাপী
তোর কাছে অভাগিনী, তাই দিলি বাছা,
এ তাপ? আশার লতা তাই রে ছিঁড়িলি!—
হা পুত্র! শোধিলি কি রে তুই এইরূপে
মাতৃধার? এই কি রে ছিল তোর মনে?—
কেন বৃথা, পোড়া আঁখি, বরষিস্ আজি
বারিধারা? রে অবোধ, কে মুছিবে তোরে?
কেন বা জ্বলিস্ মনঃ? কে জুড়াবে আজি
বাক্য-সুধারসে তোরে? পাণ্ডবের শরে
খণ্ড শিরোমণি তোর; বিবরে লুকায়ে,
কাঁদি খেদে, মর্, অরে মণিহারা ফণি!—
যাও চলি, মহাবল, যাও কুরুপুরে
নব মিত্র পার্থ সহ! মহাযাত্রা করি
চলিল অভাগী জনা পুত্রের উদ্দেশে!
ক্ষত্রকুলবালা আমি; ক্ষত্র-কুলবধূ;
কেমনে এ অপমান সব ধৈর্য ধরি?
ছাড়িব এ পোড়া প্রাণ জাহ্নবীর জলে!
দেখিব বিস্মৃতি যদি কৃতান্তনগরে
লভি অন্তে! যাচি চির-বিদায় ও পদে!
ফিরি যবে রাজপুরে প্রবেশিবে আসি,
নরেশ্বর, "কোথা জনা?" বলি ডাক যদি
উত্তরিবে প্রতিধ্বনি "কোথা জনা?" বলি!

ইতিশ্রীবীরাঙ্গনা-কাব্যে জনা-পত্রিকা নাম একাদশ সর্গ।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) : জন্ম বাংলাদেশের যশোর জেলার সাগরদাঁড়িতে। হিন্দু কলেজে পড়ার সময়েই ইংরেজিতে সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। ১৮৪৩ সালে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। বাংলায় সাহিত্যসৃষ্টি শুরু করে মধুসূদন black verse-এর অনুসরণে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করে বাংলা কাব্যে যুগান্তর আনেন। গ্রিক, ল্যাটিন ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ হল *মেঘনাদবধ কাব্য।* তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হল *তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতাবলী।* তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে অন্যতম হল *শর্মিষ্ঠা , পদ্মাবতী, মায়াকানন, কৃষ্ণকুমারী* প্রভৃতি। এছাড়াও তিনি *বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ* ও *একেই কি বলে সভ্যতা* নামে দুটি প্রহসন রচনা করেন।

বাড়ির কাছে আরশিনগর

লালন ফকির

আমি একদিনও না দেখিলাম তারে
আমার বাড়ির কাছে আরশিনগর
ও এক পড়শি বসত করে।
গ্রাম বেড়িয়ে অগাধ পানি
ও তার নাই কিনারা নাই তরণী পারে —
আমি বাঞ্ছা করি দেখব তারি
আমি কেমনে সে গাঁয় যাই রে।
বলব কি সেই পড়শির কথা
ও তার হস্ত-পদ-স্কন্ধ-মাথা নাই রে।
ও সে ক্ষণেক থাকে শূন্যের উপর
আবার ক্ষণেক ভাসে নীরে।
পড়শি যদি আমায় ছুঁত
আমার যম-যাতনা যেত দূরে।
আবার সে আর লালন একখানে রয়
তবু লক্ষ যোজন ফাঁক রে।

লালন ফকির (১৭৭৪-১৮৯০) : জন্ম বাংলাদেশের কুষ্টিয়ার ভাঁড়ারায় (মতান্তরে ঘোড়াই)। উদারধর্মীয় সাধক লালনের ধর্মীর পরিচয় নিয়ে মতান্তর আছে। ধর্মীয় ভেদাভেদ না-মানা লালন তাঁর বাউল গানের মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক মানবতার বাণী প্রচার করেছেন। তাঁর গানগুলির মধ্যে 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি', 'সবলোকে কয় লালন কী জাত', 'বাড়ির কাছে আরশিনগর' — প্রভৃতি আজও জনপ্রিয়। ঠাকুর পরিবারের জমিদারি শিলাইদহের প্রজা হওয়ায় তিনি তাঁদের সংস্পর্শে আসেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন।

দ্বীপান্তরের বন্দিনী

কাজী নজরুল ইসলাম

আসে নাই ফিরে ভারত-ভারতী?
মা'র কতদিন দ্বীপান্তর?
পুণ্যবেদির শূন্যে ধ্বনিল
ক্রন্দন — 'দেড় শত বছর।'...

সপ্ত সিন্ধু তেরো নদী পার
দ্বীপান্তরের আন্দামান,
রূপের কমল রূপার কাঠির
কঠিন স্পর্শে যেখানে ম্লান,
শতদল যেথা শতধা ভিন্ন
শস্ত্র-পাণির অস্ত্র-ঘায়,
যন্ত্রী যেখানে সান্ত্রী বসায়ে
বীণার তন্ত্রী কাটিছে হায়,
সেখান হ'তে কি বেতার-সেতারে
এসেছে মুক্ত-বন্ধ সুর?
মুক্ত কি আজ বন্দিনী বাণী?
ধ্বংস হ'ল কি রক্ষ-পুর?

যক্ষপুরীর রৌপ্য পঙ্কে
ফুটিল কি তবে রূপ-কমল?
কামান গোলার সিসা স্তূপে কি
উঠেছে বাণীর শিশমহল?
শান্তি-শুচিতে শুভ্র হল কি
রক্ত সোঁদাল খুন-খারাব?

তবে এ কীসের আর্ত আরতি,
কীসের তরে এ শঙ্খারাব?...

সাত সমুদ্র তেরো নদী পার
দ্বীপান্তরের আন্দামান,
বাণী যেথা ঘানি টানে নিশিদিন,
বন্দী সত্য ভানিছে ধান,
জীবন-চুয়ানো সেই ঘানি হ'তে
আরতির তেল এনেছ কি?
হোমানল হ'তে বাণীর রক্ষী
বীর ছেলেদের চর্বি ঘি?
হায় শৌখিন পূজারি, বৃথাই
দেবীর শঙ্খে দিতেছে ফুঁ,
পুণ্যবেদির শূন্য ভেদিয়া
ক্রন্দন উঠিতেছে শুধু!

পূজারি, কাহারে দাও অঞ্জলি?
মুক্ত ভারতী ভারতে কই?
আইন যেখানে ন্যায়ের শাসক,
সত্য বলিলে বন্দী হই,
অত্যাচারিত হইয়া যেখানে
বলিতে পারি না অত্যাচার,
যেথা বন্দিনী সীতা-সম বাণী
সহিছে বিচার-চেড়ীর মার,
বাণীর মুক্ত-শতদল যথা
আখ্যা লভিল বিদ্রোহী,
পূজারি সেখানে এসেছ কি তুমি
বাণী-পূজা-উপাচার বহি'?

সিংহেরে ভয়ে রাখে পিঞ্জরে,
ব্যাঘ্রেরে হানে অগ্নি-শেল,
কে জানিত কাল বীণা খাবে গুলি,
বাণীর কমল খাটিবে জেল!

তবে কি বিধির বেতার-মন্ত্র
বেজেছে বাণীর সেতারে আজ?
পদ্মে রেখেছে চরণ-পদ্ম
যুগান্তরের ধর্মরাজ?
তবে তাই হোক! ঢাক' অঞ্জলি,
বাজাও পাঞ্চজন্য শাঁখ!
দ্বীপান্তরের ঘানিতে লেগেছে
যুগান্তরের ঘূর্ণিপাক।

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯—১৯৭৬) : বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার জামুরিয়া থানার অন্তর্গত চুরুলিয়া গ্রামে জন্ম। ১৩২৬ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য' নামক পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা *মুক্তি* প্রকাশিত হয়। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে 'সাপ্তাহিক বিজলী'পত্রিকার ৬ জানুয়ারি সংখ্যায় *বিদ্রোহী* কবিতা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বাংলায় অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এবছরই তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'ব্যথার দান' এবং প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' প্রকাশিত হয়। কবি তাঁর কবিতায় কেবল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নয়, সমস্ত অন্যায় অবিচার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে *অগ্নিবীণা, চক্রবাক, চিত্তনামা, ছায়ানট, জিঞ্জীর, ঝড়, দোলনচাঁপা, নতুন চাঁদ, নির্ঝর, পুবের হাওয়া, প্রলয়শিখা, ফণীমনসা, বিষের বাঁশি, সর্বহারা, সাম্যবাদী* প্রভৃতি। 'সঞ্চিতা' তাঁর কবিতার এক অসামান্য সংকলন। *সওগাত, মোসলেম ভারত, নবযুগ, ধূমকেতু, লাঙল* প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর বহু প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প প্রকাশিত হয়। বাংলা গানের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান অপরিসীম।

নুন

জয় গোস্বামী

আমরা তো অল্পে খুশি; কী হবে দুঃখ করে?
আমাদের দিন চলে যায় সাধারণ ভাতকাপড়ে।

চলে যায় দিন আমাদের অসুখে ধারদেনাতে
রাত্তিরে দু-ভাই মিলে টান দিই গঞ্জিকাতে

সব দিন হয় না বাজার; হলে, হয় মাত্রাছাড়া
বাড়িতে ফেরার পথে কিনে আনি গোলাপচারা

কিন্তু পুঁতব কোথায়? ফুল কি হবেই তাতে?
সে অনেক পরের কথা। টান দিই গঞ্জিকাতে।

আমরা তো এতেই খুশি; বলো আর অধিক কে চায়?
হেসে খেলে, কষ্ট করে, আমাদের দিন চলে যায়

মাঝে মাঝে চলেও না দিন, বাড়ি ফিরি দুপুররাতে
খেতে বসে রাগ চড়ে যায়, নুন নেই ঠান্ডা ভাতে

রাগ চড়ে মাথায় আমার, আমি তার মাথায় চড়ি
বাপব্যাটা দু-ভাই মিলে সারাপাড়া মাথায় করি

করি তো কার তাতে কী? আমরা তো সামান্য লোক
আমাদের শুকনো ভাতে লবণের ব্যবস্থা হোক।

জয় গোস্বামী : জন্ম ১৯৫৪, কলকাতায়। বাংলা সাহিত্যের এক খ্যাতিমান কবি। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য কবিতার বই 'প্রত্নজীব', 'উন্মাদের পাঠক্রম', 'ভুতুমভগবান', 'ঘুমিয়েছ ঝাউপাতা?', 'বজ্রবিদ্যুৎভর্তি খাতা', 'পাগলী তোমার সঙ্গে', 'সূর্য পোড়া ছাই', 'হরিণের জন্য একক', 'ভালোটি বাসিব', 'হার্মাদ শিবির', 'গরাদ! গরাদ!' প্রভৃতি। 'যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল' তাঁর স্মরণীয় কাব্য-উপন্যাস। তাঁর রচিত বিখ্যাত উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে 'সেই সব শেয়ালেরা', 'সুড়ঙ্গ ও প্রতিরক্ষা' প্রভৃতি। বাংলা কবিতার আলোচনায় তাঁর লেখা 'আকস্মিকের খেলা', 'আমার রবীন্দ্রনাথ', 'গোঁসাইবাগান (তিন খণ্ড)' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

আন্তর্জাতিক গল্প

বিশাল ডানাওয়ালা এক থুরথুরে বুড়ো

গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ

বৃষ্টির তৃতীয় দিনে ওরা বাড়ির ভেতরে এতই কাঁকড়া মেরেছিল যে পেলাইওকে ভিজে-একশা উঠোন পেরিয়ে গিয়ে সেগুলোকে সমুদ্রে ছুড়ে ফেলে দিতে হয়েছিল, কারণ সারা রাত ধরে নবজাত শিশুটির ছিল জ্বর, আর ওরা ভেবেছিল জ্বরটা হয়েছে ওই পচা বদ গন্ধটার দরুন। মঙ্গলবার থেকেই সারা জগৎ কেমন বিষণ্ন হয়ে আছে। সমুদ্র আর আকাশ হয়ে উঠেছে একটাই ছাই-ধূসর বস্তু; আর বেলাভূমির বালি, মার্চের রাত্তিরে যা ঝকঝক করে গুঁড়ো-গুঁড়ো আলোর মতো, হয়ে উঠেছে কাদা আর পচা খোলকমাছগুলোর এক ভাপে-সেদ্ধ-হওয়া দগদগে স্তূপ। দুপুরবেলাতেই আলো এমন দুর্বল যে পেলাইও যখন কাঁকড়াগুলোকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বাড়ি ফিরছিল, তার পক্ষে দেখাই মুশকিল ছিল উঠোনের পেছন কোণটায় কী-সেটা ছটফট করে নড়তে-নড়তে কাতরাচ্ছে। তাকে খুব কাছে গিয়ে তবেই দেখতে হয়েছিল যে এক বুড়ো, খুবই থুরথুরে বুড়ো, কাদার মধ্যে মুখ গুজে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে, আর তার প্রচণ্ড সব চেষ্টা সত্ত্বেও, কিছুতেই উঠতে পারছে না, তার বিশাল দুই ডানায় কেবলই বাধা পেয়ে যাচ্ছে।

সেই দুঃস্বপ্ন দেখে আঁতকে উঠে, পেলাইও ছুটে চলে গেল এলিসেন্দার কাছে, তার বউ, যে তখন অসুস্থ বাচ্চাটির কপালে জলপট্টি দিচ্ছিল, আর পেলাইও তাকে ডেকে নিয়ে গেল উঠোনের পেছন কোণায়। পড়ে-থাকা শরীরটার দিকে তাকিয়ে তারা কেমন হতভম্ব হয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। বুড়োর পরনে ন্যাকড়াকুড়ুনির পোশাক। তার টাক-পড়া চকচকে মাথাটায় কয়েকটাই মাত্র বিবর্ণ চুল রয়েছে, ফোগলা মুখটায় খুবই কম দাঁত, আর এককালে যদি বা তার কোনো জাঁকজমক থেকেও থাকত এখন এই ঝোড়ো কাকের প্র-প্রপিতামহের করুণ দশা সে জাঁকজমক একেবারে উধাও করে দিয়েছে। তার অতিকায় শিকারি পাখির ডানা—নোংরা, আদ্ধেকটাই পালক খসা—চিরকালের মতো কাদায় জট পাকিয়ে গিয়েছে। ওরা তার দিকে এতক্ষণ ধরে খুব কাছে থেকে হাঁ করে তাকিয়েছিল যে পেলাইও আর এলিসেন্দা খানিক বাদেই তাদের প্রথম চমকটা জয় করে নিলে, বরং শেষটায় একে বেশ চেনা-চেনাই ঠেকল। তখনই সাহস করে তার সঙ্গে কথা কইবার একটা চেষ্টা করলে তারা, আর উত্তরে সে খালাশিদের যেমন গলা ফাটিয়ে কথা বলার অভ্যেস থাকে তেমনি রিনরিনে গলায় কী-এক দুর্বোধ্য বুলিতে জবাব দিলে। ওই কারণেই ওরা ডানাদুটোর ঝামেলা-টামেলাকে বেমালুম কোনো পাত্তা না দিয়েই বেশ বুদ্ধিধারীদের মতোই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাল যে সে নিশ্চয়ই তুফানে উলটে যাওয়া কোনো ভিনদেশি জাহাজের নিঃসঙ্গ ভরাডুবি নাবিক। অথচ তবু তাকে দেখাবার জন্যে ওরা এক পড়োশিনিকে ডেকে আনলে, সে আবার জীবনমৃত্যুর সব গলিঘুঁজিরই হদিস

রাখে; আর তার দিকে শুধু একবার তাকিয়েই সেই পড়োশিনির ওদের বোঝাতে দেরি হল না যে ওরা একটা মস্ত ভুল করেছে।

'এ যে এক দেবদূত', পড়োশিনি তাদের বললে। 'নিশ্চয়ই বাচ্চাকে নিয়ে যেতে আসছিল, কিন্তু বেচারা এমনই বুড়োহাবড়া যে এই মুষলবৃষ্টি তাকে একেবারে পেড়ে ফেলেছে।'

পরের দিনই সবাই জেনে গেল যে পেলাইওদের বাড়িতে এক রক্তমাংসের জ্যান্ত দেবদূতকে কয়েদ করে রাখা হয়েছে। জ্ঞানে ঝুনো ওই পড়োশিনির বিচারবুদ্ধিকে কোনো পাত্তা না দিয়ে—তার কাছে তখন দেবদূতমাত্রেই কোনো স্বর্গীয় ষড়যন্ত্রের পালিয়ে-বাঁচা নিদর্শন—ওরা তাকে মুগুরপেটা করে মেরে ফেলতে কোনো সায় পেলে না। রান্নাঘর থেকে পেলাইও সারা বিকেল তার ওপর নজর রাখলে, তাদের পালের খাটো মুগুরটায় সে সশস্ত্র; আর রাত্তিরে শুঁতে যাবার আগে তাকে সে কাদা থেকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে গিয়ে তারের জাল ঘেরা মুরগির খাঁচাটায় বন্ধ করে রাখলে। মাঝরাত্তিরে, বৃষ্টি যখন ধরে এল, পেলাইও আর এলিসেন্দা তখনও একটা পর একটা কাঁকড়া মারছে। একটু বাদেই বাচ্চাটাও জেগে উঠল মস্ত এক খাই-খাই নিয়ে, তার গায়ে আর জ্বর নেই। তখন ওরা একটু দরাজদিল হয়ে উঠল, ঠিক করলে যে এই দেবদূতকে ওরা তিনদিনের উপযোগী টাটকা জল আর খাবারদাবার দিয়ে একটা ভেলায় করে বারদরিয়ায় তার নিয়তির কাছে ছেড়ে দিয়ে আসবে। কিন্তু উষার প্রথম আলো ফোটবামাত্র যখন ওরা উঠোনে গিয়ে হাজির হল, ওরা দেখতে পেলে পুরো পাড়াটাই মুরগির খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে দেবদূতকে নিয়ে মজা করছে, রঙ্গতামাশা করছে, কারু মধ্যে কোনো সম্ভ্রমবোধ নেই, তারের মধ্যে দিয়ে তাকে ছুড়ে-ছুড়ে দিচ্ছে খাবার, যেন সে আদপেই কোনো অতিপ্রাকৃত জীব নয়—বরং যেন সে এক সার্কাসের জন্তু।

সকাল সাতটার আগেই পাদ্রে গোনসাগা এসে হাজির—এই অদ্ভুত খবরে বেশ শঙ্কিত হয়েই হন্তদন্ত হয়ে তিনি ছুটে এসেছেন। ততক্ষণে ভোরবেলাকার দর্শকদের মতো তত রঙবাজ নয় এমন দর্শকরা এসে হাজির হয়েছে, আর তারা বন্দীর ভবিষ্যৎ নিয়ে নানারকম জল্পনা-কল্পনা করতে শুরু করে দিয়েছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে সরল লোকটা ভেবে ফেলেছে যে একে সারা জগতের পুরপিতা নাম দেওয়া উচিত। অপেক্ষাকৃত কঠিন হৃদয়ের লোকেদের মনে হল একে এক পাঁচতারা সেনাপতির পদে উন্নীত করে দেওয়া হোক, যাতে সে সব যুদ্ধবিগ্রহই জিতিয়ে দিতে পারে। কিছু-কিছু দূরদর্শীর মনে হল তাকে দিয়ে যদি পৃথিবীতে কোনো ডানাওয়ালা জাতির জন্ম দেওয়ানো যায় তবে সে জাতি হবে জ্ঞানে-গুণে সবার সেরা, আর তারাই তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দায়িত্ব নিয়ে নেবে। কিন্তু পাদ্রে গোনসাগা, যাজক হবার আগে ছিলেন এক হট্টাকট্টা কাঠুরে—তারের বেড়ার পাশে দাড়িয়ে, তিনি মুহূর্তে জেরা করবার জন্যে প্রশ্নোত্তরে সব ভেবে নিলেন, আর ওদের বললেন দরজাটা খুলে দিতে, যাতে ভেতরে গিয়ে কাছে থেকে তিনি এই হতশ্রী করুণ লোকটাকে দেখে নিতে পারেন—যাকে তখন এই ভ্যাবাচাকা-খাওয়া মন্ত্রমুগ্ধ মুরগির ছানাগুলো মধ্যে এক অতিকায় জরাজীর্ণ মুরগির মতো দেখাচ্ছিল। সে শুয়ে আছে এক কোণায়, খোলা ডানাগুলো সে শুকোচ্ছে রোদ্দুরে, চারপাশে ছড়িয়ে আছে ফলের খোসা আর ছোটোহাজরির উচ্ছিষ্ট, ভোর ভোর ওঠা দর্শকরা এসে যেসব তাকে ছুড়ে দিয়েছে। পাদ্রে গোনসাগা যখন মুরগির খাঁচার মধ্যে ঢুকে পড়ে তাকে লাতিনে সুপ্রভাত জানালেন, জগতের ধৃষ্টতা আর ঔদ্ধত্য তার অচেনা

বলে সে শুধু তার প্রত্নপ্রাচীন চোখ তুলে গুনগুন করে কী একটা বললে তার ভাষায়। এ যে এক জোচ্চোর ফেরেববাজ, এবিষয়ে এ তল্লাটের যাজনপল্লির এই পুরুতটির মনে প্রথম সন্দেহটা দানা বেঁধে উঠল, বিশেষত যখন দেখতেই পেলেন যে এ ঈশ্বরের ভাষাই বোঝে না, কিংবা জানেও না কী করে ঈশ্বরের উজির-নাজিরদের সম্ভাষণ করতে হয়। তারপর তিনি খেয়াল করে দেখলেন যে খুব কাছে থেকে নজর করলে, তাকে বড্ড বেশি মানুষ মানুষ দেখায়। তার গা থেকে বেরোচ্ছে খোলামেলার এক অসহ্য গন্ধ, তার ডানাগুলোর পেছন দিকে গজিয়েছে নানারকম পরভৃৎ আর তার প্রধান পালকগুলোর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে পার্থিব সব হাওয়া; দেবদূতদের সগর্ব মর্যাদার সঙ্গে তুলনা করা যায় এমনকিছুই তার নেই। তারপর তিনি মুরগির খাঁচা থেকে বেরিয়ে এলেন এবং ছোট্ট একটি কথামৃত আউড়ে কৌতূহলীদের হুঁশিয়ার করে দিলেন ছলাকলাহীন সাদাসিধে অকপট লোক হবার ঝুঁকি কতটা; তিনি ওদের মনে করিয়ে দিলেন যে রোম্যান ক্যাথলিকদের হুল্লোড়ে উৎসবে এসে কৌশলে আচমকা ল্যাং মেরে দেবার একটা বিষম বদঅভ্যাস আছে শয়তানের—যাতে অসাবধানীদের সে বেকায়দায় ফেলে দিতে পারে, বিপথে নিয়ে যেতে পারে। তিনি যুক্তি দিয়ে বোঝালেন যে-কোনো ডানা যদি কোনো বাজপাখি আর উড়োজাহাজের তফাত নির্ধারণ করে নেবার কোনো আবশ্যিক উপাদান না হয়, তবে দেবদূতদের শনাক্ত করবার বেলায় ডানার গুরুত্ব তো আরোই কম। তৎসত্ত্বেও তিনি কথা দিলেন যে তিনি তাঁর বিশপকে একটি চিঠি দেবেন যাতে বিশপ তাঁর গির্জাশাসিত পল্লির আর্চবিশপকে লিখতে পারেন, আর তিনি তারপর লিখতে পারেন সর্বোচ্চ মোহান্তকে— যাতে উচ্চতম আদালত থেকে সর্বাধিনায়কের চূড়ান্ত রায়টি পাওয়া যায়।

তাঁর বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা—সকলই গিয়ে পড়ল বন্ধ্যা সব হৃদয়ে। বন্দি দেবদূতের খবর এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল যে কয়েকঘণ্টা বাদেই এক বড়ো হাটবাজারের ব্যস্ততা আর শোরগোল উঠল উঠোনে, আর ভিড়কে সরিয়ে দেবার জন্যে ডাকতে হলো সঙ্গিনসমেত সেনাবাহিনীকে, নইলে বাড়িটা তারা প্রায় ধসিয়েই দিত। এই হাটবাজারের এত জঞ্জাল ঝাঁট দিয়ে দিয়ে এলিসেন্দার শিরদাঁড়া যেন দুমড়ে গিয়েছে; শেষটায় তার মাথায় খেলে গেল, আরে, উঠোনের চারপাশে বেড়া দিয়ে সকলের কাছ থেকেই তো দর্শনি বাবদ পাঁচ সেন্ট করে চাওয়া যায়।

কৌতূহলীরা এল দূর-দূরান্তর থেকে। এক ভ্রাম্যমান সার্কাস দলও এসে পৌঁছাল যার ছিল এক উড়ন্ত দড়বাজিকর, সে ভিড়ের ওপর বার কয় ভোঁ-ভোঁও করলে, কিন্তু কেউ তার দিকে কোনো পাত্তাই দিলে না—কারণ তার ডানাগুলো মোটেই কোনো দেবদূতের মতো ছিল না—বরং সেগুলোকে দেখাচ্ছিল কোনো নাক্ষত্র বাদুড়ের মতো। জগতের সবচেয়ে দুর্ভাগা ও অশক্তরা এল স্বাস্থ্যের সন্ধানে; এল এক বেচারি মেয়ে জন্ম থেকেই যে গুনে যাচ্ছিল তার বুকের ধুকধুক, গুনতে গুনতে এখন সে সব সংখ্যাই শেষ করে ফেলেছে; এল এক পোর্তুগিজ—কিছুতেই যে কখনও ঘুমোতে পারে না, কারণ তারাদের কোলাহল তার ঘুম কেবলই চটিয়ে দেয়; এল এক ঘুমে হাঁটা লোক, যে দিনে জেগে থাকা অবস্থায় যা-যা করেছে সব রাত্তিরে ঘুমের ঘোরে উঠে গুবলেট করে দেয়; এছাড়াও কত কত জন, তাদের অবশ্য অত ভয়াবহ সব অসুখ নেই। পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল যে জাহাজডুবির বিশৃঙ্খলা, তার মধ্যে পেলাইও আর এলিসেন্দা অবশ্য তাদের ক্লান্তিতেই সুখী, কারণ হপ্তা শেষ হবার আগেই তারা তাদের সবগুলো ঘর ঠেসেছে টাকাকড়িতে, আর

ভেতরে ঢোকবার পালা কখন আসে তার জন্যে যে তীর্থযাত্রীর সার অপেক্ষা করছে বাইরে, তা এমনকি দিগন্তও পেরিয়ে কোথায় চলে গিয়েছে।

এই দেবদূতই ছিল একমাত্র যে তার নিজের এই হুলস্থূল নাট্যে কোনোই ভূমিকা নেয়নি। তার এই ধার-করা নীড়ে কীভাবে সে একটু আরাম পাবে, তারই চেষ্টায় সে কাটায় সারা সময়—তেলের বাতি বা উপাসনার মোমবাতিগুলোর নারকীয় জ্বালায় আর উত্তাপে তার প্রায় মাথা খারাপ হবার জোগাড়, অথচ ওগুলো সারাক্ষণ ওই তারের খাঁচায় জ্বলছে। গোড়ায় তাকে ওরা ন্যাপথালিন খাওয়াবার চেষ্টা করেছিল, সেই পরমজ্ঞানী পড়োশিনির প্রজ্ঞা অনুযায়ী তাই নাকি দেবদূতের খাদ্য হিসেবে বিধানবিদিত। কিন্তু সে ওসব ফিরিয়ে দিয়েছে, যেমন সে ফিরিয়ে দিয়েছে পোপের ভোজ, পাপীতাপীরা প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যে মানত করে এসব ভূরিভোজ তার কাছে নিয়ে এসেছিল; আর তারা কখনও এটা বুঝে উঠতে পারেনি সে যে বেগুনভর্তা ছাড়া আর কিছুই খায় না, সে কি সে একজন দেবদূত বলে না কি ফোগলা দাঁতের এক বুড়ো থুরথুরে বলে। তবে একমাত্র অতিপ্রাকৃত শক্তি মনে হল তার ধৈর্য। বিশেষত প্রথম দিনগুলোয়, তার ডানায় যেসব নাক্ষত্র পরভৃৎ জম্পেশ করে গজিয়েছে তার খোঁজে যখন মুরগিরা তাকে ঠোকরাত, আর পঙ্গুরা ছিড়ে নিত তার পালক তাদের বিকল ঠুটো অঙ্গগুলোয় ছোঁয়াবার জন্যে, আর এমনকি যাদের প্রাণে সবচেয়ে দয়াধর্ম ছিল তারাও যখন তাকে তাগ করে ঢিল ছুড়ত যাতে সে উঠে পড়ে আর দাঁড়ালে তাকে কেমন দেখায় সেটা দেখবার জন্যে—তখনও সে শান্তই থাকত। একমাত্র যেবার তারা তাকে উসকে তাতিয়ে দিতে পেরেছিল সে তখনই যখন তারা তার পাশটা পুড়িয়ে ছিল তপ্ত লোহায়, যা দিয়ে ছ্যাঁকা লাগিয়ে তারা বলদের গায়ে মার্কা দিত—কারণ সে এতক্ষণ কেমন ঝিম মেরে নিশ্চল পড়েছিল যে তারা ভেবেছিল সে বুঝি মরেই গিয়েছে। আঁতকে জেগে উঠেছিল সে তখন, তার ওই রুদ্ধ দুর্বোধ্য অচেনা ভাষায় চেঁচিয়ে প্রলাপ বকেছিল, চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এসেছিল তার, আর সে তার ডানা ঝাপটেছিল বার দুই, যা মুরগির বিষ্ঠা আর চান্দ্র ধুলোর এক ঘূর্ণিহাওয়া তুলে দিয়েছিল, আর এমন একটা দমকা ঝাপটা তুলেছিল আতঙ্কের যাকে কিছুতেই এই জগতের বলে মনে হয়নি। যদিও অনেকে ভেবেছিল তার সাড়াটা ঠিক ক্রোধের নয়, বরং জ্বালার, ব্যথার। আর সেই থেকে তারা হুঁশিয়ার হয়ে যায় যাতে তাকে আর এমন চটিয়ে দেওয়া না হয়, কারণ বেশিরভাগ লোকই বুঝেছিল তার এই নিষ্ক্রিয় ঔদাস্য মোটেই কোনো বীরনায়কের বিশ্রাম নয়, বরং কোনো মহাপ্লাবনের পূর্বমুহূর্তের থমথমে ছমছমে ঘুম।

বাড়ির ঝি-চাকরানিদের প্রেরণা পাওয়া সব সূত্র দিয়েই পাদ্রে গোনসাগা ভিড়ের ছ্যাবলামিটা ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। বন্দির প্রকৃতি সম্বন্ধে চূড়ান্ত রায় কী আসে তারই জন্যে অপেক্ষা করছিলেন তিনি। কিন্তু রোম থেকে আসা চিঠিতে কোনো তাড়াই দেখা গেল না। তারা তাদের সময় কাটিয়ে দিলে এই সব প্রশ্নে—বন্দির কোনো নাভি আছে কি না, তার কথাবার্তার সঙ্গে সিরিয়াস প্রাচীন ভাষার কোনো সম্পর্ক আছে কি না, একটা ছুঁচের ডগায় তার মতো কটা মাথা এটে যায়, অথবা সে কি নিছকই নরওয়ের কোনো লোক, গায়ে ডানা লাগিয়ে নিয়েছে। ওই সব তুচ্ছ অতি সংক্ষিপ্ত চিঠিগুলো হয়তো সময়ের শেষ অব্দিই যাতায়াত করতে থাকত, যদি না এক দৈব ঘটনা পাদ্রে গোনসাগার সব নাজেহাল বিপত্তির একটা ইতি টেনে দিত।

ঘটেছিল কী, ওই দিনগুলোয়, আরো সব কত কত উৎসব মেলা আর সার্কাসের হরেকরকম বা আকর্ষণের মধ্যে, শহরে এসে পৌঁছেছিল একটি মেয়ের ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী, যে তার বাবা-মার কথার অবাধ্য হয়েছিল বলে মাকড়শা হয়ে গিয়েছে। দেবদূতকে দেখতে যত পয়সা দিতে হয়, একে দেখতে যেতে তার চেয়ে যে কম পয়সা দর্শনি বাবদ দিতে হয়, শুধু তাই নয়, তার এই অসম্ভব দশার জন্যে লোককে যা খুশি প্রশ্ন করবারও সুযোগ দেওয়া হয়, এমনকি তাকে আগাপাশতলা খুঁটিয়েও দেখতে দেওয়া হয় যাতে তার এই বিভীষিকার সত্য-মিথ্যা সম্বন্ধে কারো মনেই কোনো সন্দেহ না থাকে। সে এক ভয়ংকর তারানতুলা, একটা মস্ত ভেড়ার মতো বড়ো, আর তার মাথাটা এক বিষাদময়ী কুমারী মেয়ের। যা ছিল সবচেয়ে হৃদয় বিদারক, তা কিন্তু তার এই তাজ্জব আকৃতি নয়, বরং তার অকৃত্রিম দুঃখী করুণ গলা, যে গলায় সে তার দুর্ভাগ্যের সব খুঁটিনাটি বর্ণনা করত। যখন সে একেবারেই ছেলেমানুষ, এক নাচের আসরে যাবে বলে কাউকে কিছু না জানিয়ে সে তার বাবা-মার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল, আর অনুমতি না নিয়ে সারা রাত ধরে নাচবার পর সে যখন এক বনের মধ্যে দিয়ে ফিরছিল তখন হঠাৎ এক ভয়ংকর বজ্রপাত আকাশকে দু-ভাগে ফেড়ে দিয়েছিল আর ফাটলের মধ্য দিয়ে নেমে এসেছিল জ্বলন্ত গন্ধকের এক বিদ্যুৎশিখা যা তাকে বদলে দিয়েছিল এই আজব মাকড়শায়। যাদের প্রাণে দয়াদাক্ষিণ্য আছে তারা তার মুখে মাংসের বড়া ছুড়ে দেয়—একমাত্র তাই তাকে অ্যাদ্দিন ধরে বাঁচিয়ে রেখেছে। এরকম এক দৃশ্য, যার মধ্যে এতই মানবিক সত্য আর এমন এক ভয়ংকর শিক্ষা আছে, যে তা চেষ্টা না করেও হারিয়ে দিতে পারে কোনো উদ্ধত দেবদূতের প্রদর্শনী, যে দেবদূত কিনা ক্বচিৎ কখনও নাক সিটকে তাকায় মর্ত্যবাসীদের দিকে। তাছাড়া, দেবদূতের নামে যে কটা অলৌকিক অঘটনের দায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল তা শুধু এক ধরনের মানসিক বিশৃঙ্খলাই বোঝাচ্ছিল। যেমন— এক অন্ধ আতুর, সে তার দৃষ্টি ফিরে পায়নি বটে, তবে তার তিনটে নতুন দাঁত গজিয়ে গিয়েছিল; কিংবা এক পঙ্গু বেচারি যে হেঁটে হেঁটে গিরিলঙ্ঘন করতে পারেনি বটে তবে একটা লটারি প্রায় জিতেই যাচ্ছিল; কিংবা এক কুষ্ঠরোগী যার ঘাগুলো থেকে গজিয়েছিল সূর্যমুখী ফুল। কোনো সান্ত্বনা পুরস্কারের মতো এসব অলৌকিক কাণ্ড আসলে প্রায় বিসদৃশ সব মশকরা বা কৌতুকের মতোই—আর এ সবের ফলেই দেবদূতের মানসম্ভ্রম খ্যাতি ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছিল—তারপর মাকড়শায় বদলে যাওয়া মেয়েটি আসতেই তার সব নামডাক একেবারেই ধসে পড়ল। এইভাবেই পাদ্রে গোনসাগা তাঁর অনিদ্রা রোগ থেকে চিরকালের মতো রেহাই পেয়ে গেলেন আর পেলাইওদের উঠোন সেইরকমই ফাঁকা হয়ে গেল তিনদিন তিনরাত্তির যখন একটানা ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়েছিল আর কাঁকড়ারা হাঁটছিল তাদের শোবার ঘরে।

বাড়ির মালিকদের অবশ্য বিলাপ করার কোনোই কারণ ছিল না। যে টাকা তারা কামিয়েছিল তা দিয়ে তারা এক চকমেলানো দোতলা বাড়ি বানিয়ে নিলে, সে বাড়ির ছিল অলিন্দ আর বাগান আর উঁচু তারের জাল শীতের সময় যাতে কাঁকড়ারা আর ভেতরে ঢুকতে না পারে, আর জানালায় ছিল লোহার গরাদ যাতে কোনো পথহারা দেবদূতও ঢুকে পড়তে না পারে আচমকা। শহরের কাছেই পেলাইও একটা খরগোশ পালন করবার ঘিঞ্জি গোলকধাঁধা বানিয়ে নিলে, চিরকালের মতো ইস্তফা দিলে তারা সাধ্যপালের কাজে, আর এলিসেন্দা কিনে নিলে কতগুলো উঁচু ক্ষুরওয়ালা ঢাকা জুতো আর রামধনু-রঙা রেশমি কাপড়ের অনেক

প্রস্থ পোশাক, তখনকার দিনে রোববারে রোববারে যেসব পোশাক পরত সবচেয়ে অভিজাত ও কাঙ্ক্ষিত মহিলারা। যা যা তাদের কোনো মনোযোগ পায়নি, তার মধ্যে মুরগির খাঁচাটাই একমাত্র জিনিস ছিল না। যদি তারা রাসায়নিক দিয়ে তা ধুয়ে দিয়ে থাকে আর তার ভেতরে বারবার মস্তকির অশ্রু পুড়িয়ে থাকে, সে কিন্তু মোটেই এই দেবদূতের অর্চনায় নয়, বরং সেই গু-গোবরের স্তূপের দুর্গন্ধ তাড়িয়ে দিতেই—ভূতের মতো এখনও যা ঝুলে আছে সবখানে, আর নতুন দালানটাকে বানিয়ে দিচ্ছে পোড়োবাড়ি। গোড়ায়, যখন তাদের বাচ্চা হাঁটতে শিখল, তারা খুবই সাবধানে ছিল সে যাতে কখনও মুরগির খাঁচাটার খুব কাছে না যায়। কিন্তু তারপর তারা ক্রমে ক্রমে তাদের ভয় হারাতে শুরু করল, আর গন্ধটায় অভ্যস্ত হয়ে গেল। বাচ্চার দ্বিতীয় দাঁতটি বেরোবার আগেই সে মুরগির খাঁচার ভেতরে খেলতে চলে যেত, খাঁচার তারাগুলো ততদিনে অবহেলায় অযত্নে ছিঁড়ে ছিঁড়ে গিয়েছে। অন্য কোনো মর্ত্যবাসীর সঙ্গে কোনো মাখামাখিই করেনি দেবদূত, বরং দূরে দূরেই থাকত, এখনও সে তেমন একটা মাখামাখি করে না; তবে সব ভুল ধারণা হারিয়ে বসবার পর কোনো কুকুর যেমন বাচ্চাদের যাবতীয় যাচ্ছেতাই অপমান ও নিগ্রহ পরম ধৈর্যভরে সহ্য করে, তেমনি ধৈর্যের সঙ্গে দেবদূত এই বাচ্চাটিকে সহ্য করত। একই সঙ্গে দুজনকেই পেড়ে ফেলল জলবসন্ত। যে ডাক্তার বাচ্চাটির রোগ দেখতে এসেছিল সে অবশ্য দেবদূতের হৃৎপিণ্ডের ধুকপুক শোনবার লোভ সামলাতে পারলে না, আর সে তার বুকে এত শিস শুনতে পেলে আর এতই শোরগোল শুনতে পেলে তার বুক্কে যে তার পক্ষে বেঁচে থাকাই সম্ভব বলে ডাক্তারের মনে হল না। যেটা তাকে সবচেয়ে তাক লাগিয়ে দিলে সেটা এই ডানা দুটোর যুক্তি ও প্রকৃতি। এ দুটি এমনই স্বাভাবিক যে পুরোপুরি কোনো মানুষেরই আবশ্যিক অঙ্গ বলে মনে হয়, আর তার অবাক লাগল এই ভেবে যে অন্য মানুষদেরই বা কোনো ডানা নেই কেন।

বাচ্চা যখন স্কুলে যাওয়া শুরু করল, সেটা রোদে বৃষ্টিতে মুরগির খাঁচার সম্পূর্ণ ধ্বংসের কিছুকাল পরে। দেবদূত এখন এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়, পথহারা দিকভোলা কোনো মুমূর্ষের মতো। ওরা তাকে ঝাঁটা মেরে বার করে দেয় শোবার ঘর থেকে, কিন্তু পরক্ষণেই তাকে দ্যাখে রান্নাঘরে, একই সঙ্গে তাকে এত বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় বলে মনে হয় যে তারা অবাক হয়ে ভাবে এর আবার আরো কতগুলো সংস্করণ হয়ে গেল নাকি—সে কি নিজেকেই তৈরি করছে বাড়ির সকল কোণায়খামচিতে? আর বিপর্যস্ত ও তিতিবিরক্ত এলিসেন্দা ডুকরে গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে বলতে লাগল দেবদূতে দেবদূতে থই থই করা কোনো নরকে বাস করা কী যে জঘন্য কাণ্ড ! দেবদূত এখন খেতেই পারে না কিছু, তার প্রত্নপ্রাচীন চোখও এখন এত ঘোলাটে হয়ে গেছে যে সবসময়ে সে জিনিসপত্তরে ধাক্কা খায়। তার শেষ পালকগুলোর নিছক সূক্ষ্ম জালের মতো দাঁড়গুলোই এখন আছে তার। পেলাইও একটা কম্বল ছুড়ে দেয় তার ওপর, তাকে করুণা করে একটা আটচালার নীচে শুতে দেয়। আর শুধু তখনই তারা আবিষ্কার করলে যে রোজ রাত্তিরে তার জ্বর আসে, আর কোনো বুড়ো নরওয়েবাসীর জিভজড়ানো ভাষায় সে বিকারের ঘোরে প্রলাপ বকে। যে কয়েকবার তারা বিষম ভয় পেয়ে গিয়েছিল, এ তারই একটা, কারণ তারা ধরেই নিয়েছিল যে এ বুঝি মরতে বসেছে, আর তাদের জ্ঞানীগুণী পড়োশিনি অব্দি তাদের বলতে পারলে না কোনো মরা দেবদূতকে নিয়ে তারা কী করবে।

অথচ তবু যে সে তার সবচেয়ে জঘন্য শীতকালটাই টিকে গেল তাই নয়, প্রথম রোদ্দুরে ভরা দিনগুলো আসতেই মনে হল সে ক্রমেই সেরে উঠছে। উঠোনের সবচেয়ে দূর কোণায় সে কয়েকদিন নিশ্চল পড়ে

থাকে, যেখানে কেউই তাকে দেখতে পায় না; আর ডিসেম্বরের গোড়ায় তার ডানায় মস্ত কতগুলো আড় ধরা পালক গজিয়ে ওঠে, কোনো কাকতাড়ুয়ার পালক যেন সেগুলো, তার জরার আরেকটা দুর্ভাগা লক্ষণ বলেই মনে হল এই পালকগুলোকে। কিন্তু সে নিজে নিশ্চয়ই জানতে পেরেছিল এসব বদলের আসল কারণ, কেন-না কেউ যাতে তা না দেখতে পায় এবিষয়ে সে খুবই সজাগ ছিল, সে খুবই সাবধান ছিল কেউ যাতে শুনতে না পায় আকাশভরা ঝিকিমিকি তারার তলায় সে যখন সিন্ধুরোলের গান গুনগুন করে। একদিন সকালে এলিসেন্দা যখন পেঁয়াজকলির গুচ্ছ কাটছে, তখন আচমকা মনে হল হঠাৎ যেন দূর বারদরিয়ার এক ঝলক হাওয়া এসে ঢুকেছে রান্নাঘরে। তখন সে জানালায় গিয়ে দেখতে পেলে দেবদূত এই প্রথম তার ডানা ছড়িয়ে ওড়বার চেষ্টা করছে। কিন্তু এমনই অগোছালো ও অনভ্যস্ত তার এ অপচেষ্টা যে তার নখগুলো সবজিবাগানের মধ্যে গভীর সব খাঁজ কেটে দিচ্ছে। আর সে হয়তো তার জবুথবু উলটোপালটা ডানা ঝাপটানিতে আটচালাটাও ধসিয়ে দিত, বিশেষত বারে বারে সে যেরকম হড়কে যাচ্ছিল, কিছুতেই আঁটো করে চেপে ধরতে পারছিল না হাওয়া। তবু অবশ্য কেমন নড়বড়েভাবে সে একটু উঠতে পারল ওপরে। এলিসেন্দা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে—নিজের জন্যে স্বস্তি আর দেবদূতের জন্যেও স্বস্তি—যখন সে দেখতে পেলে যে দেবদূত এখন শেষ বাড়িগুলোর ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে, কোনোরকমে সে নিজেকে ধরে রেখেছে উড়ালটায়, কোনো মতিচ্ছন্ন জরাগ্রস্ত শকুনের ঝুঁকিতে ভরা ডানাঝাপটানি দিয়ে। পেঁয়াজ কাটা সারা হয়ে যাবার পরও এলিসেন্দা তাকে দেখতেই থাকে তাকিয়ে। দেখতেই থাকে যখন তাকে আর দেখাই সম্ভব ছিল না—কারণ সে তো আর তখন তার জীবনের কোনো উৎপাত বা জ্বালাতন নয়, বরং সমুদ্রের দিকচক্রবালে নিছকই কাল্পনিক একটা ফুটকিই যেন।

অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ (১৯২৭-২০১৪) : জন্ম দক্ষিণ আমেরিকার কলম্বিয়ার আরকাটাকায়। দীর্ঘদিন সাংবাদিক হিসেবে দক্ষিণ আমেরিকার ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে কাটান। মূলত ঔপন্যাসিক হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন। গদ্য সাহিত্যে 'জাদু বাস্তবতা' ধারার তিনিই প্রধান প্রবক্তা। একশো বছরের নিঃসঙ্গতা, কলেরার দিনগুলিতে প্রেম, কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না, চিলিতে গোপনে, বিপন্ন এক নাবিকের গল্প, এই শহরে কোন চোর নেই প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত রচনা। ১৯৮২ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পান। তাঁর জাদু বাস্তবতা ধারার পাঠ্য এই ছোটোগল্পটি 'এই শহরে কোন চোর নেই' থেকে নেওয়া হয়েছে।

ভারতীয় কবিতা

শিক্ষার সার্কাস

আইয়াপ্পা পানিকর

তুমি যদি প্রথম শ্রেণিতে পাস করো?
আমি দ্বিতীয় শ্রেণিতে যেতে পারি।
তুমি যদি দ্বিতীয় শ্রেণিতে পাস করো?
যদি আমি দ্বিতীয় শ্রেণি পাস করি,
বেশ, আমি সোজা তৃতীয় শ্রেণিতে যেতে পারি।
তুমি যদি তৃতীয় শ্রেণিও পাস করো?

বেশ, আমি তৃতীয় শ্রেণিও পাস করি, বেশ তাহলে,
এক, দুই, তিন..... চার!
তাহলে আমি চতুর্থ শ্রেণিতে বসতে পারি।

তুমি যদি এই সবগুলো শ্রেণি পাস করো?
যদি সব শ্রেণি শেষ হয়ে যায়,
আমি তবু পরের শ্রেণিতে যাব।

সব শিক্ষা একটি সার্কাস
যার সাহায্যে আমরা পরের শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হই।
জ্ঞান কোথায় গেল?
সে যেখানে গেছে, সেটা ধোঁকা!

অনুবাদ : উৎপলকুমার বসু

আইয়াপ্পা পানিকর (১৯৩০-২০০৬) : জন্ম কেরালার কোভালামে। মালয়ালম কাব্য সাহিত্যে আধুনিক যুগ সৃষ্টিতে আইয়াপ্পা পানিকরের অবদান স্মরণীয়। তিনি ছিলেন একই সঙ্গে প্রাবন্ধিক ও সাহিত্য সমালোচক। বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। ১৯৬০-এ প্রকাশিত তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'কুরুক্ষেত্রম' মালয়ালম কাব্যসাহিত্যের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : *আইয়াপ্পা পানিক্করুদে কৃতিকল* ও *চিন্তা*।

পূর্ণাঙ্গ
সহায়ক গ্রন্থ

গুরু

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

অচলায়তন

একদল বালক

প্রথম। ওরে ভাই শুনেছিস?

দ্বিতীয়। শুনেছি — কিন্তু চুপ কর।

তৃতীয়। কেন বল দেখি?

দ্বিতীয়। কী জানি বললে যদি অপরাধ হয়?

প্রথম। কিন্তু উপাধ্যায়মশায় নিজে যে আমাকে বলেছেন।

তৃতীয়। কী বলেছেন বল না।

প্রথম। গুরু আসছেন।

তৃতীয়। ভয় করছে না ভাই?

দ্বিতীয়। ভয় করছে।

প্রথম। আমার ভয় করছে না, মনে হচ্ছে মজা।

তৃতীয়। কিন্তু ভাই গুরু কী?

দ্বিতীয়। তা জানি নে।

তৃতীয়। কে জানে?

দ্বিতীয়। এখানে কেউ জানে না।

প্রথম। শুনেছি গুরু খুব বড়ো, খুব মস্ত বড়ো।

তৃতীয়। তা হলে এখানে কোথায় ধরবে?

প্রথম। পঞ্চকদাদা বলেন অচলায়তনে তাঁকে কোথাও ধরবে না।

তৃতীয়। কোথাও না?

প্রথম। কোথাও না।

তৃতীয়। তা হলে কী হবে?

প্রথম। ভারি মজা হবে।

[প্রস্থান

পঞ্চকের প্রবেশ

পঞ্চক।

গান

তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে কেউ তা জানে না।
আমার মন যে কাঁদে আপন মনে কেউ তা মানে না।
ওরে ভাই, কে আছিস ভাই। কাকে ডেকে বলব, গুরু আসছেন।

সঞ্জীবের প্রবেশ

সঞ্জীব। তাই তো শুনেছি। কিন্তু কে এসে খবর দিলে বলো তো।

পঞ্চক। কে দিলে তা তো কেউ বলে না।

সঞ্জীব। কিন্তু গুরু আসছেন বলে তুমি তো তৈরি হচ্ছ না পঞ্চক?

পঞ্চক। বাঃ, সেইজন্যেই তো পুঁথিপত্র সব ফেলে দিয়েছি।

সঞ্জীব। সেই বুঝি তোমার তৈরি হওয়া?

পঞ্চক। আরে, গুরু যখন না থাকেন তখনই পুঁথিপত্র। গুরু যখন আসবেন তখন ওই সব জঞ্জাল সরিয়ে দিয়ে সময় খোলসা করতে হবে। আমি সেই পুঁথি বন্ধ করবার কাজে ভয়ানক ব্যস্ত।

সঞ্জীব। তাই তো দেখছি।

[প্রস্থান

পঞ্চক।

গান

ফিরি আমি উদাস প্রাণে, তাকাই সবার মুখের পানে,
তোমার মতো এমন টানে কেউ তো টানে না।

ওহে জয়োত্তম, তুমি কাঁধে কীসের বোঝা নিয়ে চলেছ? বোঝা ফেলো। গুরু আসছেন যে।

জয়োত্তম। আরে ছুঁয়ো না; এ সব মাঙ্গল্য। গুরুর জন্যে সিংহদ্বার সাজাতে চলেছি।

পঞ্চক। গুরু কোন দ্বার দিয়ে ঢুকবেন তা জানবে কী করে?

জয়োত্তম। তা তো বটেই। অচলায়তনে জানবার লোক কেবল তুমিই আছ।

পঞ্চক। তোমরাও জানো না, আমিও জানিনে — তফাতটা এই যে, তোমরা বোঝা বয়ে মরো, আমি হালকা হয়ে বসে আছি।

জয়োত্তম। আচ্ছা, এখন পথ ছাড়ো, আমার সময় নেই।

[প্রস্থান

পঞ্চক।

গান

বেজে ওঠে পঞ্চমে স্বর, কেঁপে ওঠে বন্ধ এ ঘর,
বাহির হতে দুয়ারে কর কেউ তো হানে না।

মহাপঞ্চকের প্রবেশ

মহাপঞ্চক। গান! অচলায়তনে গান! মতিভ্রম হয়েছে!

পঞ্চক। এবার দাদা, স্বয়ং তোমাকেও গান ধরতে হবে। একধার থেকে মতিভ্রমের পালা আরম্ভ হল।

মহাপঞ্চক। আমি মহাপঞ্চক, গান ধরব! ঠাট্টা আমার সঙ্গে!

পঞ্চক। ঠাট্টা নয়। অচলায়তনে এবার মন্ত্র ঘুচে গান আরম্ভ হবে। এই বোবা পাথরগুলো থেকে সুর বেরোবে।

মহাপঞ্চক। কেন বলো তো?

পঞ্চক। গুরু আসছেন যে! তাই আমার কেবলই মন্তরে ভুল হচ্ছে।

মহাপঞ্চক। গুরু এলে তোমার জন্যে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারব না।

পঞ্চক। তার জন্য ভাবনা কী? নির্লজ্জ হয়ে একলা আমিই মুখ দেখাব।

মহাপঞ্চক। মন্তরে ভুল হলে গুরু তোমাকে আয়তন থেকে দূর করে দেবেন।

পঞ্চক। সেই ভরসাতেই তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে আছি।

মহাপঞ্চক। অমিতায়ুর্ধারণী মন্ত্রটা —

পঞ্চক। সেই মন্ত্রটা স্বয়ং গুরুর কাছ থেকে শিখব বলেই তো আগাগোড়া ভোলবার চেষ্টায় আছি। সেইজন্যেই গান ধরেছি দাদা।

মহাপঞ্চক। ওই শঙ্খ বাজল। এখন আমার সপ্তমকুমারিকা গাথা পাঠের সময়। কিন্তু বলে যাচ্ছি, সময় নষ্ট কোরো না। গুরু আসছেন।

পঞ্চক।

গান

আকাশে কার ব্যাকুলতা, বাতাস বহে কার বারতা,
এ পথে সেই গোপন কথা কেউ তো আনে না।।

ও কী ও! কান্না শুনি যে! এ নিশ্চয়ই সুভদ্র। আমাদের এই অচলায়তনে ওই বালকের চোখের জল আর শুকোল না। ওর কান্না আমি সইতে পারিনে।

[প্রস্থান ও বালক সুভদ্রকে লইয়া পুনঃপ্রবেশ

পঞ্চক। তোর কোনো ভয় নেই ভাই, কোনো ভয় নেই। তুই আমার কাছে বল — কী হয়েছে বল।

সুভদ্র। আমি পাপ করেছি।

পঞ্চক। পাপ করেছিস? কী পাপ?

সুভদ্র। সে আমি বলতে পারব না। ভয়ানক পাপ। আমার কী হবে?

পঞ্চক। তোর সব পাপ আমি কেড়ে নেব, তুই বল।

সুভদ্র। আমি আমাদের আয়তনের উত্তর দিকের —

পঞ্চক। উত্তর দিকের?

সুভদ্র। হাঁ, উত্তর দিকের জানলা খুলে—

পঞ্চক। জানালা খুলে কী করলি?

সুভদ্র। বাইরেটা দেখে ফেলেছি।

পঞ্চক। দেখে ফেলেছিস? শুনে লোভ হচ্ছে যে।

সুভদ্র। হাঁ পঞ্চকদাদা। কিন্তু বেশিক্ষণ না — একবার দেখেই তখনই বন্ধ করে ফেলেছি। কোন প্রায়শ্চিত্ত করলে আমার পাপ যাবে?

পঞ্চক। ভুলে গেছি ভাই। প্রায়শ্চিত্ত বিশ-পঁচিশ হাজার রকম আছে; আমি যদি এই আয়তনে না আসতুম তা হলে তার বারো-আনাই কেবল পুঁথিতে লেখা থাকত — আমি আসার পর প্রায় তার সবকটাই ব্যবহারে লাগাতে পেরেছি, কিন্তু মনে রাখতে পারিনি।

বালকদলের প্রবেশ

প্রথম। অ্যাঁ, সুভদ্র! তুমি বুঝি এখানে!

দ্বিতীয়। জান পঞ্চকদাদা, সুভদ্র কী ভয়ানক পাপ করেছে?

পঞ্চক। চুপ চুপ! ভয় নেই, সুভদ্র, কাঁদছিস কেন ভাই? প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় তো করবি। প্রায়শ্চিত্ত করতে ভারি মজা। এখানে রোজই একঘেয়ে রকমের দিন কাটে, প্রায়শ্চিত্ত না থাকলে তো মানুষ টিকতেই পারত না।

প্রথম। (চুপিচুপি) জান পঞ্চকদাদা, সুভদ্র উত্তর দিকের জানলা—

পঞ্চক। আচ্ছা, আচ্ছা, সুভদ্রের মতো তোদের অত সাহস আছে?

দ্বিতীয়। আমাদের আয়তনের উত্তর দিকটা যে একজটা দেবীর!

তৃতীয়। সেদিক থেকে আমাদের আয়তনে যদি একটুও হাওয়া ঢোকে তাহলে যে সে —

পঞ্চক। তা হলে কী?

তৃতীয়। সে যে ভয়ানক।

পঞ্চক। কী ভয়ানক শুনিই না।

তৃতীয়। জানি নে, কিন্তু সে ভয়ানক।

সুভদ্র। পঞ্চকদাদা, আমি আর কখনো খুলব না পঞ্চকদাদা। আমার কী হবে?

পঞ্চক। শোন বলি সুভদ্র, কীসে কী হয় আমি ভাই কিছুই জানিনে — কিন্তু যাই হোক না, আমি তাতে একটুও ভয় করি নে।

সুভদ্র। ভয় করো না?

সকল ছেলে। ভয় করো না?

পঞ্চক। না। আমি তো বলি, দেখিই না কী হয়।

সকলে। (কাছে ঘেঁষিয়া) আচ্ছা দাদা, তুমি বুঝি অনেক দেখেছ?

পঞ্চক। দেখেছি বইকি। ও মাসে শনিবারে যেদিন মহাময়ূরী দেবীর পূজা পড়ল, সেদিন আমি কাঁসার থালায় ইঁদুরের গর্তের মাটি রেখে, তার উপর পাঁচটা শেয়ালকাঁটার পাতা আর তিনটে মাষকলাই সাজিয়ে নিজে আঠারো বার ফুঁ দিয়েছি।

সকলে। অ্যাঁ! কী ভয়ানক! আঠারো বার!

সুভদ্র। পঞ্চকদাদা, তোমার কী হল?

পঞ্চক। তিনদিনের দিন যে সাপটা এসে আমাকে নিশ্চয় কামড়াবে কথা ছিল, সে আজ পর্যন্ত আমাকে খুঁজে বের করতে পারেনি।

প্রথম। কিন্তু ভয়ানক পাপ করেছ তুমি।

দ্বিতীয়। মহাময়ূরী দেবী ভয়ানক রাগ করেছেন।

পঞ্চক। তার রাগটা কী রকম সেইটে দেখবার জন্যেই তো একাজ করেছি!

সুভদ্র। কিন্তু পঞ্চকদাদা, যদি তোমাকে সাপে কামড়াত!

পঞ্চক। তা হলে মাথা থেকে পা পর্যন্ত কোথাও কোনো সন্দেহ থাকত না — ভাই সুভদ্র, জানলা খুলে তুই কী দেখলি বল দেখি।

দ্বিতীয়। না, না বলিসনে।

তৃতীয়। না, সে আমরা শুনতে পারব না — কী ভয়ানক!

প্রথম। আচ্ছা, একটু — খুব একটুখানি বল ভাই।

সুভদ্র। আমি দেখলুম সেখানে পাহাড়, গোরু চরছে —

বালকগণ। (কানে আঙুল দিয়া) ও বাবা, না না, আর শুনব না। আর বোলো না সুভদ্র। ওই যে উপাধ্যায়মশাই আসছেন। চল চল — আর না।

পঞ্চক। কেন? এখন তোমাদের কী?

প্রথম। বেশ, তাও জান না বুঝি? আজ যে পূর্বফাল্গুনী নক্ষত্র —

পঞ্চক। তাতে কী?

দ্বিতীয়। আজ কাকিনী সরোবরের নৈর্ঋত কোণে ঢোঁড়া সাপের খোলস খুঁজতে হবে না?

পঞ্চক। কেন রে?

প্রথম। তুমি কিছু জান না পঞ্চকদাদা। সেই খোলস কালো রঙের ঘোড়ার লেজের সাতগাছি চুল দিয়ে বেঁধে পুড়িয়ে ধোঁয়া করতে হবে যে।

দ্বিতীয়। আজ যে পিতৃপুরুষেরা সেই ধোঁয়া ঘ্রাণ করতে আসবেন।

পঞ্চক। তাতে তাঁদের কষ্ট হবে না?

প্রথম। পুণ্য হবে যে, ভয়ানক পুণ্য।

[সুভদ্র ব্যতীত বালকগণের প্রস্থান

উপাধ্যায়ের প্রবেশ

সুভদ্র। উপাধ্যায়মশায়!

পঞ্চক। আরে পালা পালা। উপাধ্যায়মশায়ের কাছ থেকে একটু পরমার্থতত্ত্ব শুনতে হবে, এখন বিরক্তি করিস নে, একেবারে দৌড়ে পালা।

উপাধ্যায়। কী সুভদ্র, তোমার বক্তব্য কী শীঘ্র বলে যাও।

সুভদ্র। আমি ভয়ানক পাপ করেছি।

পঞ্চক। ভারি পণ্ডিত কিনা। পাপ করেছি! পালা বলছি।

উপাধ্যায়। (উৎসাহিত হইয়া) পাপ করেছ? ওকে তাড়া দিচ্ছ কেন? সুভদ্র, শুনে যাও।

পঞ্চক। আর রক্ষা নেই, পাপের এতটুকু গন্ধ পেলে একেবারে মাছির মতো ছোটে।

উপাধ্যায়। কী বলছিলে?

সুভদ্র। আমি পাপ করেছি।

উপাধ্যায়। পাপ করেছ? আচ্ছা বেশ। তা হলে বোসো। শোনা যাক।

সুভদ্র। আমি আয়তনের উত্তর দিকের —

উপাধ্যায়। বলো, বলো, উত্তর দিকের দেয়ালে আঁক কেটেছ?

সুভদ্র। না, আমি উত্তর দিকের জানলায় —

উপাধ্যায়। বুঝেছি, কুনুই ঠেকিয়েছ। তাহলে তো সেদিকে আমাদের যতগুলি যজ্ঞের পাত্র আছে সমস্তই ফেলা যাবে। সাত মাসের বাছুরকে দিয়ে ওই জানলা না চাটাতে পারলে শোধন হবে না।

পঞ্চক। এটা আপনি ভুল বলছেন। ক্রিয়াসংগ্রহে আছে, ভূমিকুষ্মাণ্ডের বোঁটা দিয়ে একবার —

উপাধ্যায়। তোমার তো স্পর্ধা কম দেখি নে। কুলদত্তের ক্রিয়াসংগ্রহের অষ্টাদশ অধ্যায়টি কি কোনোদিন খুলে দেখা হয়েছে?

পঞ্চক। (জনান্তিকে) সুভদ্র, যাও তুমি। — কিন্তু কুলদত্তকে তো আমি —

উপাধ্যায়। কুলদত্তকে মানো না? আচ্ছা, ভরদ্বাজ মিশ্রের প্রয়োগপ্রজ্ঞপ্তি তো মানতেই হবে — তাতে —

সুভদ্র। উপাধ্যায়মশায়, আমি ভয়ানক পাপ করেছি।

পঞ্চক। আবার! সেই কথাই তো হচ্ছে। তুই চুপ কর।

উপাধ্যায়। সুভদ্র, উত্তরের দেয়ালে যে আঁক কেটেছ সে চতুষ্কোণ, না গোলাকার?

সুভদ্র। আঁক কাটিনি। আমি জানলা খুলে বাইরে চেয়েছিলুম।

উপাধ্যায়। (বসিয়া পড়িয়া) আঃ সর্বনাশ! করেছিস কী? আজ তিনশো পঁয়তাল্লিশ বছর ওই জানলা কেউ খোলেনি তা জানিস?

সুভদ্র। আমার কী হবে?

পঞ্চক। (সুভদ্রকে আলিঙ্গন করিয়া) তোমার জয়জয়কার হবে সুভদ্র। তিনশো পঁয়তাল্লিশ বছরের আগল তুমি ঘুচিয়েছ। তোমার এই অসামান্য সাহস দেখে উপাধ্যায়মশায়ের মুখে আর কথা নেই। গুরু আসার পথ তুমিই প্রথম খোলসা করে দিলে।

[প্রস্থান

আচার্য ও উপাচার্যের প্রবেশ

আচার্য। এতকাল পরে আমাদের গুরু আসছেন।

উপাচার্য। তিনি প্রসন্ন হয়েছেন।

আচার্য। প্রসন্ন হয়েছেন? তা হবে। হয়তো প্রসন্নই হয়েছেন। কিন্তু কেমন করে জানব?

উপাচার্য। নইলে তিনি আসবেন কেন?

আচার্য। এক-এক সময়ে মনে ভয় হয় যে, হয়তো অপরাধের মাত্রা পূর্ণ হয়েছে বলেই তিনি আসছেন।

উপাচার্য। না আচার্যদেব, এমন কথা বলবেন না। আমরা কঠোর নিয়ম সমস্তই নিঃশেষে পালন করেছি — কোনো ত্রুটি ঘটেনি।

আচার্য। কঠোর নিয়ম? হাঁ সমস্তই পালিত হয়েছে।

উপাচার্য। ব্রজশুদ্ধিব্রত আমাদের আয়তনে এইবার নিয়ে ঠিক সাতাত্তরবার পূর্ণ হয়েছে। আর কোনো আয়তনে এ কি সম্ভবপর হয়!

আচার্য। না, আর কোথাও হতে পারে না।

উপাচার্য। কিন্তু তবু আপনার মনে এমন দ্বিধা হচ্ছে কেন?

আচার্য। সূতসোম, তোমার মনে কি তুমি শান্তি পেয়েছ?

উপাচার্য। আমার তো এক মুহূর্তের জন্যে অশান্তি নেই।

আচার্য। অশান্তি নেই?

উপাচার্য। কিছুমাত্র না। আমার অহোরাত্র একেবারে নিয়ম বাঁধা। এর চেয়ে আর শান্তি কী হতে পারে?

আচার্য। ঠিক, ঠিক — ঠিক বলেছ সূতসোম। অচেনার মধ্যে গিয়ে কোথায় তার অন্ত পাব? এখানে সমস্তই জানা, সমস্তই অভ্যস্ত — এখানকার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর এখানকারই সমস্ত শাস্ত্রের ভিতর থেকে

পাওয়া যায় — তার জন্যে একটুও বাইরে যাবার দরকার হয় না। এই তো নিশ্চল শান্তি!

উপাচার্য। আচার্যদেব, আপনাকে এমন বিচলিত হতে কখনো দেখিনি।

আচার্য। কী জানি, আমার কেমন মনে হচ্ছে, কেবল একলা আমিই না, চারিদিকে সমস্তই বিচলিত হয়ে উঠছে। আমার মনে হচ্ছে, আমাদের এখানকার দেয়ালের প্রত্যেক পাথরটা পর্যন্ত বিচলিত। তুমি এটা অনুভব করতে পারছ না সূতসোম?

উপাচার্য। কিছুমাত্র না। এখানকার অটল স্তব্ধতার লেশমাত্র বিচ্যুতি দেখতে পাচ্ছিনে। আমাদের তো বিচলিত হবার কথাও না। আমাদের সমস্ত শিক্ষা কোন কালে সমাধা হয়ে গেছে। আমাদের সমস্ত লাভ সমাপ্ত, সমস্ত সঞ্চয় পর্যাপ্ত। ওই যে পঞ্চক আসছে। পাথরের মধ্যে কি ঘাস বেরোয়? এমন ছেলে আমাদের আয়তনে কী করে সম্ভব হল। ওই আমাদের দুর্লক্ষণ। এই আয়তনের মধ্যে ও কেবল আপনাকেই মানে। আপনি ওকে একটু ভর্ৎসনা করে দেবেন।

আচার্য। আচ্ছা তুমি যাও। আমি ওর সঙ্গে একটু নিভৃতে কথা কয়ে দেখি।

[উপাচার্যের প্রস্থান

পঞ্চকের প্রবেশ

আচার্য। (পঞ্চকের গায়ে হাত দিয়া) বৎস পঞ্চক!

পঞ্চক । করলেন কী! আমাকে ছুঁলেন?

আচার্য। কেন, বাধা কী আছে?

পঞ্চক। আমি যে আচার রক্ষা করতে পারিনি।

আচার্য। কেন পারোনি বৎস?

পঞ্চক। প্রভু, কেন, তা আমি বলতে পারিনে। আমার পারবার উপায় নেই।

আচার্য। সৌম্য, তুমি যে জানো, এখানকার যে নিময় সেই নিয়মকে আশ্রয় করে হাজার বছর হাজার হাজার লোক নিশ্চিন্ত আছে। আমরা যে খুশি তাকে কি ভাঙতে পারি?

পঞ্চক। আচার্যদেব, যে নিয়ম সত্য তাকে ভাঙতে না দিলে তার যে পরীক্ষা হয় না। তাই কি ঠিক নয়?

আচার্য। যাও বৎস, তোমার পথে তুমি যাও। আমাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা কোরো না।

পঞ্চক। আচার্যদেব, আপনি জানেন না কিন্তু আপনিই আমাকে নিয়মের চাকার নীচে থেকে টেনে নিয়েছেন।

আচার্য। কেমন করে বৎস?

পঞ্চক। তা জানি নে, কিন্তু আপনি আমাকে এমন একটা কিছু দিয়েছেন যা আচারের চেয়ে, নিয়মের চেয়ে অনেক বেশি।

আচার্য। তুমি কী করো না-করো আমি কোনোদিন জিজ্ঞাসা করিনে, কিন্তু আজ একটি কথা জিজ্ঞাসা করব। তুমি কি অচলায়তনের বাইরে গিয়ে যূনক জাতির সঙ্গে মেশো?

পঞ্চক। আপনি কি এর উত্তর শুনতে চান?

আচার্য। না না থাক, বোলো না। কিন্তু যূনকেরা যে অত্যন্ত ম্লেচ্ছ। তাদের সহবাস কি —

পঞ্চক। তাদের সম্বন্ধে আপনার কি কোনো বিশেষ আদেশ আছে?

আচার্য। না না, আদেশ আমার কিছুই নেই। যদি ভুল করতে হয় তবে ভুল করো গে — তুমি ভুল করো গে — আমাদের কথা শুনো না!

পঞ্চক। ওই উপাচার্য আসছেন — বোধ করি কাজের কথা আছে — বিদায় হই।

[প্রস্থান

উপাধ্যায় ও উপাচার্যের প্রবেশ

উপাচার্য। (উপাধ্যায়ের প্রতি) আচার্যদেবকে তো বলতেই হবে। উনি নিতান্ত উদবিগ্ন হবেন — কিন্তু দায়িত্ব যে ওঁরই।

আচার্য। উপাধ্যায়, কোনো সংবাদ আছে নাকি?

উপাধ্যায়। অত্যন্ত মন্দ সংবাদ।

আচার্য। অতএব সেটা সত্বর বলা উচিত।

উপাধ্যায়। আচার্যদেব, সুভদ্র আমাদের আয়তনের উত্তর দিকের জানলা খুলে বাইরে দৃষ্টিপাত করেছে।

আচার্য। উত্তর দিকটা তো একজটা দেবীর।

উপাধ্যায়। সেই তো ভাবনা। আমাদের আয়তনের মন্ত্রপূত রুদ্ধ বাতাসকে সেখানকার হাওয়া কতটা দূর পর্যন্ত আক্রমণ করেছে বলা তো যায় না।

উপাচার্য। এখন কথা হচ্ছে, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কী।

আচার্য। আমার তো স্মরণ হয় না। উপাধ্যায় বোধ করি—

উপাধ্যায়। না, আমিও তো মনে আনতে পারিনে। আজ তিনশো বছর এ প্রায়শ্চিত্তটার প্রয়োজন হয়নি — সবাই ভুলেই গেছে। ওই যে মহাপঞ্চক আসছে — যদি কারও জানা থাকে তো সে ওর।

মহাপঞ্চকের প্রবেশ

উপাধ্যায়। মহাপঞ্চক, সব শুনেছ বোধ করি।

মহাপঞ্চক। সেইজন্যেই তো এলুম; আমরা এখন সকলেই অশুচি, বাহিরের হাওয়া আমাদের আয়তনে প্রবেশ করেছে।

উপাচার্য। এর প্রায়শ্চিত্ত কী, আমাদের কারও স্মরণ নেই। তুমিই হয়তো বলতে পারো।

মহাপঞ্চক। ক্রিয়াকল্পতরুতে এর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না — একমাত্র ভগবান জ্বলনানন্তকৃত আধিকর্মিক বর্ষায়ণে লিখছে, অপরাধীকে ছয়মাস মহাতামস সাধন করতে হবে।

উপাচার্য। মহাতামস?

মহাপঞ্চক। হাঁ, ওকে অন্ধকারে রেখে দিতে হবে, আলোকের এক রশ্মিমাত্রও দেখতে পাবে না। কেন-না, আলোকের দ্বারা যে অপরাধ অন্ধকারের দ্বারাই তার ক্ষালন।

উপাচার্য। তা হলে, মহাপঞ্চক, সমস্ত ভার তোমার উপর রইল।

উপাধ্যায়। চলো আমিও তোমার সঙ্গে যাই। ততক্ষণ সুভদ্রকে হিঙ্গুমর্দনকুণ্ডে স্নান করিয়ে আনি গে।

[সকলের গমনোদ্যম

আচার্য। শোনো, প্রয়োজন নেই।

উপাধ্যায়। কীসের প্রয়োজন নেই?

আচার্য। প্রায়শ্চিত্তের।

মহাপঞ্চক। প্রয়োজন নেই বলছেন! আধিকর্মিক বর্ষায়ণ খুলে আমি এখনই দেখিয়ে দিচ্ছি —

আচার্য। দরকার নেই — সুভদ্রকে কোনো প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না, আমি আশীর্বাদ করে তার —

মহাপঞ্চক। এও কি কখনো সম্ভব হয়? যা কোনো শাস্ত্রে লেখা নেই আপনি কি তাই —

আচার্য। না, হতে দেব না, যদি কোনো অপরাধ ঘটে সে আমার। তোমাদের ভয় নেই।

উপাধ্যায়। এরকম দুর্বলতা তো আপনার কোনোদিন দেখিনি! এই তো সেবার অষ্টাঙ্গশুদ্ধি উপবাসে তৃতীয় রাত্রে বালক কুশলশীল জল জল করে পিপাসায় প্রাণত্যাগ করলে কিন্তু তবু তার মুখে যখন এক বিন্দু জল দেওয়া গেল না, তখন তো আপনি নীরব হয়েছিলেন। তুচ্ছ মানুষের প্রাণ আজ আছে কাল নেই, কিন্তু সনাতন ধর্মবিধি তো চিরকালের।

সুভদ্রকে লইয়া পঞ্চকের প্রবেশ

পঞ্চক। ভয় নেই সুভদ্র, তোর কোনো ভয় নেই — এই শিশুটিকে অভয় দাও প্রভু।

আচার্য। বৎস, তুমি কোনো পাপ করোনি। যারা বিনা অপরাধে তোমাকে হাজার হাজার বৎসর ধরে মুখ বিকৃত করে ভয় দেখাচ্ছে, পাপ তাদেরই। এসো পঞ্চক।

[সুভদ্রকে কোলে লইয়া পঞ্চকের সঙ্গে প্রস্থান

উপাধ্যায়। এ কী হল উপাচার্যমশায়?

[উপাচার্যের প্রস্থান

মহাপঞ্চক। আমরা অশুচি হয়ে রইলুম, আমাদের যাগযজ্ঞ ব্রত উপবাসে সকলই পণ্ড হতে থাকল, এ তো সহ্য করা শক্ত।

উপাধ্যায়। এ সহ্য করা চলবেই না। আচার্য কী শেষে আমাদের ম্লেচ্ছের সঙ্গে সমান করে দিতে চান?

মহাপঞ্চক। উনি আজ সুভদ্রকে বাঁচাতে গিয়ে সনাতন ধর্মকে বিনাশ করবেন। এ কী রকম বুদ্ধিবিকার ওঁর ঘটল! এ অবস্থায় ওঁকে আচার্য বলে গণ্য করাই চলবে না।

সঞ্জীব, বিশ্বম্ভর, জয়োত্তমের প্রবেশ

সঞ্জীব। এতদিন এখানে সব ঠিক চলছিল। যেই গুরু আসবেন রব উঠল অমনি কেন এইসব অনাচার ঘটতে লাগল?

বিশ্বম্ভর। আচার্য অদীনপুণ্য যদি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করেন, তবে তিনি যেরকম আছেন থাকুন কিন্তু আমরা তাঁর কোনো অনুশাসন মানব না।

জয়োত্তম। তিনি বলেন, তাঁর গুরু তাঁকে যে আসনে বসিয়েছেন তাঁর গুরুই তাঁকে সেই আসন থেকে নামিয়ে দেবেন, সেইজন্য তিনি অপেক্ষা করেছেন।

অধ্যেতার প্রবেশ

উপাধ্যায়। কী গো অধ্যেতা, ব্যাপার কী?

অধ্যেতা। সুভদ্রকে মহাতামসে বসায় কার সাধ্য?

মহাপঞ্চক। কেন কী বিঘ্ন ঘটেছে?

অধ্যেতা। মূর্তিমান বিঘ্ন রয়েছে তোমার ভাই।

মহাপঞ্চক। পঞ্চক?

অধ্যেতা। হাঁ। আমি ডাকতেই সুভদ্র ছুটে এল, কিন্তু পঞ্চক তাকে কেড়ে নিয়ে গেল।

মহাপঞ্চক। না, এই নরাধমকে নিয়ে আর চলল না। অনেক সহ্য করেছি। এবার ওকে নির্বাসন দেওয়াই স্থির। কিন্তু অধ্যেতা, তুমি এটা সহ্য করলে?

অধ্যেতা। আমি কি তোমার পঞ্চককে ভয় করি? স্বয়ং আচার্য অদীনপুণ্য এসে তাকে আদেশ করলেন, তাই তো সে সাহস পেলে।

সঞ্জীব। স্বয়ং আমাদের আচার্য!

বিশ্বম্ভর। ক্রমে এসব হচ্ছে কী! এতদিন এই আয়তনে আছি, কখনো তো এমন অনাচারের কথা শুনিনি। আর স্বয়ং আমাদের আচার্যের এই কীর্তি!

জয়োত্তম। তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করেই দেখা যাক না।

বিশ্বম্ভর। না না, আচার্যকে আমরা —

মহাপঞ্চক। কী করবে আচার্যকে, বলেই ফেলো।

বিশ্বম্ভর। তাই তো ভাবছি কী করা যায়। তাঁকে না হয় — আপনি বলে দিন না কী করতে হবে।

মহাপঞ্চক। আমি বলছি তাঁকে সংযত করে রাখতে হবে।

সঞ্জীব। কেমন করে?

মহাপঞ্চক। কেমন করে আবার কী? মত্ত হস্তীকে যেমন করে সংযত করতে হয় তেমনি করে।

জয়োত্তম। আমাদের আচার্যদেবকে কী তা হলে —

মহাপঞ্চক। হাঁ, তাঁকে বন্ধ রাখতে হবে। চুপ করে রইলে যে! পারবে না?

আচার্যের প্রবেশ

আচার্য। বৎস, এতদিন তোমরা আমাকে আচার্য বলে মেনেছ, আজ তোমাদের সামনে আমার বিচারের দিন এসেছে। আমি স্বীকার করছি অপরাধের অন্ত নেই, তার প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করতে হবে।

সঞ্জীব। তবে আর দেরি করেন কেন? এদিকে যে আমাদের সর্বনাশ হয়।

আচার্য। গুরু চলে গেলেন, আমরা তাঁর জায়গায় পুঁথি নিয়ে বসলুম; সেই জীর্ণ পুঁথির ভাণ্ডারে প্রতিদিন তোমরা দলে দলে আমার কাছে তোমাদের তরুণ হৃদয়টি মেলে ধরে কী চাইতে এসেছিলে? অমৃতবাণী? কিন্তু আমার তালু যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। রসনায় যে রসের লেশমাত্র নেই। এবার নিয়ে এসো সেই বাণী, গুরু, নিয়ে এসো হৃদয়ের বাণী। প্রাণকে প্রাণ দিয়ে জাগিয়ে দিয়ে যাও।

পঞ্চক। (ছুটিয়া প্রবেশ করিয়া) তোমার নববর্ষার সজল হাওয়ায় উড়ে যাক সব শুকনো পাতা — আয় রে নবীন কিশলয় — তোরা ছুটে আয়, তোরা ফুটে বেরো। ভাই জয়োত্তম, শুনছ না, আকাশের ঘননীল মেঘের মধ্যে মুক্তির ডাক উঠেছে — আজ নৃত্য করো রে নৃত্য করো।

গান

ওরে ওরে ওরে আমার মন মেতেছে,
তারে আজ থামায় কে রে।
সে যে আকাশ পানে হাত পেতেছে,
তারে আজ নামায় কে রে।

প্রথমে জয়োত্তমের, পরে বিশ্বম্ভরের, পরে সঞ্জীবের নৃত্যগীতে যোগ

মহাপঞ্চক। পঞ্চক, নির্লজ্জ বানর কোথাকার, থাম বলছি থাম।

পঞ্চক।

গান

ওরে আমার মন মেতেছে
আমারে মাথায় কে রে।

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, আমি তোমাকে বলিনি একজটা দেবীর শাপ আরম্ভ হয়েছে? দেখছ, কী করে তিনি আমাদের সকলের বুদ্ধিকে বিচলিত করে তুলছেন — ক্রমে দেখবে অচলায়তনের একটি পাথরও আর থাকবে না।

পঞ্চক। না, থাকবে না, থাকবে না, পাথরগুলো সব পাগল হয়ে যাবে; তারা কে কোথায় ছুটে বেরিয়ে পড়বে, তারা গান ধরবে —

ওরে ভাই, নাচ রে, ও ভাই, নাচ রে —
আজ ছাড়া পেয়ে বাঁচ রে, —
লাজভয় ঘুচিয়ে দে রে;
তোরে আজ থামায় কে রে!

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কী। সর্বনাশ শুরু হয়েছে, বুঝতে পারছ না। ওরে সব ছন্নমতি মূর্খ, অভিশপ্ত বর্বর, আজ তোদের নাচবার দিন?

পঞ্চক। সর্বনাশের বাজনা বাজলেই নাচ শুরু হয় দাদা।

মহাপঞ্চক। চুপ কর লক্ষ্মীছাড়া! ছাত্রগণ, তোমরা আত্মবিস্মৃত হোয়ো না। ঘোর বিপদ আসন্ন, সে কথা স্মরণ রেখো।

বিশ্বম্ভর। আচার্যদেব, পায়ে ধরি, সুভদ্রকে আমাদের হাতে দিন, তাকে তার প্রায়শ্চিত্ত থেকে নিরস্ত করবেন না।

আচার্য। না বৎস, এমন অনুরোধ কোরো না।

সঞ্জীব। ভেবে দেখুন, সুভদ্রের কতবড়ো ভাগ্য। মহাতামস কজন লোকে পারে। ও যে ধরাতলে দেবত্ব লাভ করবে!

আচার্য। গায়ের জোরে দেবতা গড়বার পাপে আমাকে লিপ্ত কোরো না। সে মানুষ, সে শিশু, সেইজন্যেই সে দেবতাদের প্রিয়।

জয়োত্তম। দেখুন, আপনি আমাদের আচার্য, আমাদের প্রণম্য, কিন্তু যে অন্যায় কাজ করছেন, তাতে আমরা বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য হব।

আচার্য। করো, বলপ্রয়োগ করো, আমাকে মেনো না, আমাকে মারো, আমি অপমানেরই যোগ্য, তোমাদের হাত দিয়ে আমার যে শাস্তি আরম্ভ হল, তাতেই বুঝতে পারছি গুরুর আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু সেইজন্যেই বলছি শাস্তির কারণ আর বাড়তে দেব না। সুভদ্রকে তোমাদের হাতে দিতে পারব না।

বিশ্বম্ভর। পারবেন না?

আচার্য। না।

মহাপঞ্চক। তা হলে আর দ্বিধা করা নয়। বিশ্বম্ভর, এখন তোমাদের উচিত ওঁকে জোর করে ধরে নিয়ে ঘরে বন্ধ করা। ভীরু, কেউ সাহস করছ না? আমাকেই তবে একাজ করতে হবে?

জয়োত্তম। খবরদার — আচার্যদেবের গায়ে হাত দিতে পারবে না।

বিশ্বম্ভর। না না, মহাপঞ্চক, ওঁকে অপমান করলে আমরা সইতে পারব না।

সঞ্জীব। আমরা সকলে মিলে পায়ে ধরে ওঁকে রাজি করাব। একা সুভদ্রের প্রতি দয়া করে উনি কী আমাদের সকলের অমঙ্গল ঘটাবেন?

বিশ্বম্ভর। এই অচলায়তনের এমন কত শিশু উপবাসে প্রাণত্যাগ করেছে — তাতে ক্ষতি কী হয়েছে?

সুভদ্রের প্রবেশ

সুভদ্র। আমাকে মহাতামস ব্রত করাও।

পঞ্চক। সর্বনাশ করলে! ঘুমিয়ে পড়েছে দেখে আমি এখানে এসেছিলুম কখন জেগে উঠে চলে এসেছে।

আচার্য। বৎস সুভদ্র, এসো আমার কোলে। যাকে পাপ বলে ভয় করছ সে পাপ আমার — আমিই প্রায়শ্চিত্ত করব।

বিশ্বম্ভর। না না, আয়রে আয় সুভদ্র, তুই মানুষ না, দুই দেবতা।

সঞ্জীব। তুই ধন্য।

বিশ্বম্ভর। তোর বয়সে মহাতামস করা আর কারও ভাগ্যে ঘটেনি। সার্থক তোর মা তোকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন।

উপাধ্যায়। আহা সুভদ্র, তুই আমাদের অচলায়তনেরই বালক বটে।

মহাপঞ্চক। আচার্য, এখনো কী তুমি জোর করে এই বালককে এই মহাপুণ্য থেকে বঞ্চিত করতে চাচ্ছ?

আচার্য। হায় হায়, এই দেখেই তো আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তোমরা যদি ওকে কাঁদিয়ে আমার হাত থেকে ছিঁড়ে কেড়ে নিয়ে যেতে তা হলেও আমার এত বেদনা হত না। কিন্তু দেখছি হাজার বছরের নিষ্ঠুর মুষ্টি অতটুকু শিশুর মনকেও চেপে ধরেছে, একেবারে পাঁচ আঙুলের দাগ বসিয়ে দিয়েছে রে! কখন সময় পেল সে? সে কি গর্ভের মধ্যেও কাজ করে?

পঞ্চক। সুভদ্র, আয় ভাই, প্রায়শ্চিত্ত করতে যাই — আমিও যাব তোর সঙ্গে।

আচার্য। বৎস, আমিও যাব।

সুভদ্র। না না, আমাকে যে একলা থাকতে হবে — লোক থাকলে যে পাপ হবে।

মহাপঞ্চক। ধন্য শিশু, তুমি তোমার ওই প্রাচীন আচার্যকে আজ শিক্ষা দিলে! এসো তুমি আমার সঙ্গে।

আচার্য। না, আমি যতক্ষণ তোমাদের আচার্য আছি ততক্ষণ আমার আদেশ ব্যতীত কোনো ব্রত আরম্ভ বা শেষ হতেই পারে না। আমি নিষেধ করছি। সুভদ্র, আচার্যের কথা অমান্য করো না — এসো পঞ্চক, ওকে কোলে করে নিয়ে এসো।

[সুভদ্রকে লইয়া পঞ্চকের ও আচার্যের এবং উপাধ্যায়ের প্রস্থান

মহাপঞ্চক। ধিক্! তোমাদের মতো ভীরুদের দুর্গতি হতে রক্ষা করে এমন সাধ্য কারও নেই। তোমরা নিজেও মরবে, অন্য সকলকে মারবে।

পদাতিকের প্রবেশ

পদাতিক। স্থবিরপত্তনের রাজা আসছেন।

মহাপঞ্চক। ব্যাপারখানা কী! এ যে আমাদের রাজা মন্থরগুপ্ত!

রাজার প্রবেশ

রাজা। নরদেবগণ, তোমাদের সকলকে নমস্কার।

সকলে। জয়োস্তু রাজন্।

মহাপঞ্চক। কুশল তো?

রাজা। অত্যন্ত মন্দ সংবাদ। প্রত্যন্তদেশের দূতেরা এসে খবর দিল যে, দাদাঠাকুরের দল এসে আমাদের রাজ্যসীমার কাছে বাসা বেঁধেছে।

মহাপঞ্চক। দাদাঠাকুরের দল কারা?

রাজা। ওই যে যূনকরা।

মহাপঞ্চক। যূনকরা যদি একবার আমাদের প্রাচীর ভাঙে তাহলে যে সমস্ত লণ্ডভণ্ড করে দেবে!

রাজা। সেইজন্যেই তো ছুটে এলুম। চণ্ডক বলে একজন যূনক আমাদের স্থবিরক সম্প্রদায়ের মন্ত্র পাবার জন্যে গোপনে তপস্যা করছিল। আমি সংবাদ পেয়েই তার শিরশ্ছেদ করেছি।

মহাপঞ্চক। ভালোই করেছেন। কিন্তু এ দিকে অচলায়তনের মধ্যেই যে পাপ প্রবেশ করেছে তার কী করলেন? আমাদের পরাভবের আর দেরি কী?

রাজা। সে কী কথা!

সঞ্জীব। আয়তনে একজটা দেবীর শাপ লেগেছে।

রাজা। একজটা দেবীর শাপ! সর্বনাশ! কেন তাঁর শাপ?

মহাপঞ্চক। যে উত্তর দিকে তাঁর অধিষ্ঠান এখানে একদিন সেই দিককার জানলা খোলা হয়েছে।

রাজা। (বসিয়া পড়িয়া) তবে তো আর আশা নেই।

মহাপঞ্চক। আচার্য অদীনপুণ্য এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দিচ্ছেন না।

বিশ্বম্ভর। তিনি জোর করে আমাদের ঠেকিয়ে রেখেছেন।

রাজা। দাও, দাও, অদীনপুণ্যকে এখনই নির্বাসিত করে দাও!

মহাপঞ্চক। আগামী অমাবস্যায় —

রাজা। না না, এখন তিথিনক্ষত্র দেখবার সময় নেই। বিপদ আসন্ন। সংকটের সময় আমি আমার রাজ-অধিকার খাটাতে পারি — শাস্ত্রে তার বিধান আছে।

মহাপঞ্চক। হাঁ আছে। কিন্তু আচার্য কে হবে?

রাজা। তুমি, তুমি। এখনই আমি তোমাকে আচার্যের পদে প্রতিষ্ঠিত করে দিলুম। দিক্‌পালগণ সাক্ষী, এই ব্রহ্মচারীগণ সাক্ষী।

মহাপঞ্চক। অদীনপুণ্যকে কোথায় নির্বাসিত করতে চান?

রাজা। আয়তনের বাইরে নয়। কী জানি যদি যূনকদের সঙ্গে যোগ দেন। আয়তনের প্রান্তে যে দর্ভকপাড়া আছে সেইখানে তাঁকে বন্ধ করে রেখো।

জয়োত্তম। আচার্য অদীনপুণ্যকে দর্ভকদের পাড়ায়! তারা যে অন্ত্যজজাতি — অশুচি পতিত।

মহাপঞ্চক। যিনি স্পর্ধাপূর্বক আচার লঙ্ঘন করেন, অনাচারীদের মধ্যে নির্বাসনই তাঁর উচিত দণ্ড। মনে কোরো না আমার ভাই বলে পঞ্চককে ক্ষমা করব। তারও সেই দর্ভকপাড়ায় গতি।

দূতের প্রবেশ

দূত। শুনলুম গুরু খুব কাছে এসেছেন।

রাজা। কে বললে?

দূত। চারিদিকেই কথা উঠেছে।

রাজা। তাহলে তো তাঁর অভ্যর্থনার আয়োজন করতে হবে। মহাপঞ্চক, অচলায়তনের সমস্ত জানলা বন্ধ করে শুদ্ধিমন্ত্র পাঠ করতে থাকো।

মহাপঞ্চক। জানলা বন্ধ সম্বন্ধে ভাববেন না। মন্ত্রের ভার আমি নিচ্ছি।

[রাজার প্রস্থান

পঞ্চক কোথায়?

জয়োত্তম। শুনলাম সে প্রাচীর ডিঙিয়ে যূনকদের কাছে গেছে।

মহাপঞ্চক। পাষণ্ড! আর যেন সে আয়তনে ফিরে না আসে। গুরু আসবার আগেই এখানকার সমস্ত উপদ্রব দূর করা চাই। ওহে ব্রহ্মচারিগণ, মন্ত্র পড়বার জন্যে স্নান করে প্রস্তুত হয়ে এসো।

২

পাহাড় মাঠ

পঞ্চকের গান

এ পথ গেছে কোনখানে গো কোনখানে —
তা কে জানে তা কে জানে।
কোন পাহাড়ের পারে, কোন সাগরের ধারে,
কোন দুরাশার দিকপানে —
তা কে জানে তা কে জানে।
এ পথ দিয়ে কে আসে যায় কোনখানে
তা কে জানে তা কে জানে।
কেমন তার বাণী, কেমন হাসিখানি,
যায় সে কাহার সন্ধানে
তা কে জানে তা কে জানে।

পশ্চাতে আসিয়া যূনকদলের নৃত্য

পঞ্চক। ও কী রে! তোরা কখন পিছনে এসে নাচতে লেগেছিলি?

প্রথম যূনক। আমরা নাচবার সুযোগ পেলেই নাচি, পা দুটোকে স্থির রাখতে পারিনে।

দ্বিতীয় যূনক। আয় ভাই, ওকে সুদ্ধ কাঁধে করে নিয়ে একবার নাচি।

পঞ্চক। আরে না না, আমাকে ছুঁস নে রে, ছুঁসনে।

তৃতীয় যূনক। ওই রে! ওকে অচলায়তনের ভূতে পেয়েছে। যূনককে ছোঁবে না।

পঞ্চক। জানিস, আমাদের গুরু আসবেন?

প্রথম যূনক। সত্যি নাকি? তিনি মানুষটি কী রকম? তাঁর মধ্যে নতুন কিছু আছে?

পঞ্চক। নতুনও আছে, পুরোনোও আছে।

দ্বিতীয় যূনক। আচ্ছা, এলে খবর দিয়ো — একবার দেখব তাঁকে।

পঞ্চক। তোরা দেখবি কী রে! সর্বনাশ! তিনি তো যূনকদের গুরু নন। তাঁর কথা তোদের কানে পাছে এক অক্ষরও যায় সেজন্যে তোদের দিকের প্রাচীরের বাইরে সাত সার রাজার সৈন্য পাহারা দেবে। তোদেরও তো গুরু আছে — তাকে নিয়েই —

তৃতীয় যূনক। গুরু! আমাদের আবার গুরু কোথায়? আমরা তো হলুম দাদাঠাকুরের দল। এপর্যন্ত আমরা তো কোনো গুরুকে মানিনি।

প্রথম যূনক। সেইজন্যই তো জিনিসটা কী রকম দেখতে ইচ্ছা করে।

দ্বিতীয় যূনক। আমাদের মধ্যে একজন, তার নাম চঙক — তার কী জানি ভারি লোভ হয়েছে; সে ভেবেছে তোমাদের কোনো গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়ে আশ্চর্য কী একটা ফল পাবে — তাই সে লুকিয়ে চলে গেছে।

তৃতীয় যূনক। কিন্তু যূনক বলে কেউ তাকে মন্ত্র দিতে চায় না। সেও ছাড়বার ছেলে নয়, সে লেগেই রয়েছে। তোমরা মন্ত্র দাও না বলেই মন্ত্র আদায় করবার জন্যে তার এত জেদ।

প্রথম যূনক। কিন্তু পঞ্চকদাদা, আমাদের ছুঁলে কী তোমার গুরু রাগ করবেন?

পঞ্চক। বলতে পারিনে — কী জানি যদি অপরাধ নেন। ওরে, তোরা যে সবাই সবরকম কাজই করিস — সেইটে যে বড়ো দোষ। তোরা চাষ করিস তো?

প্রথম যূনক। চাষ করি বইকি, খুব করি। পৃথিবীতে জন্মেছি, পৃথিবীকে সেটা খুব কষে বুঝিয়ে দিয়ে তবে ছাড়ি।

গান

আমরা চাষ করি আনন্দে।
মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সন্ধে।
রৌদ্র ওঠে, বৃষ্টি পড়ে, বাঁশের বনে পাতা নড়ে,
বাতাস ওঠে ভরে ভরে চষা মাটির গন্ধে।
সবুজ প্রাণের গানের লেখা, রেখায় রেখায় দেয় রে দেখা,
মাতে রে কোন তরুণ কবি নৃত্যদোদুল ছন্দে।
ধানের শিষে পুলক ছোটে, সকল ধরা হেসে ওঠে,
অঘ্রানেরি সোনার রোদে পূর্ণিমারি চন্দ্রে।।

পঞ্চক। আচ্ছা, না হয় তোরা চাষই করিস, সেও কোনোমতে সহ্য হয় — কিন্তু কে বলছিল তোরা কাঁকুড়ের

চাষ করিস?

প্রথম যূনক। করি বইকি।

পঞ্চক। কাঁকুড়! ছি ছি! খেঁসারিডালেরও চাষ করিস বুঝি?

তৃতীয় যূনক। কেন করব না? এখান থেকেই তো কাঁকুড় আর খেঁসারিডাল তোমাদের বাজারে যায়।

পঞ্চক। তা তো যায়, কিন্তু জানিস নে কাঁকুড় আর খেঁসারিডাল যারা চাষ করে তাদের আমরা ঘরে ঢুকতে দিইনে।

প্রথম যূনক। কেন?

পঞ্চক। কেন কী রে! ওটা যে নিষেধ।

প্রথম যূনক। কেন নিষেধ?

পঞ্চক। শোনো একবার! নিষেধ, আবার কেন! সাধে তোদের মুখদর্শন পাপ। এই সহজ কথাটা বুঝিসনে যে, কাঁকুড় আর খেঁসাড়িডালের চাষটা ভয়ানক খারাপ।

দ্বিতীয় যূনক। কেন? ওটা কী তোমরা খাও না।

পঞ্চক। খাই বইকি, খুব আদর করে খাই — কিন্তু ওটা যারা চাষ করে তাদের ছায়া মাড়াই নে।

দ্বিতীয় যূনক। কেন?

পঞ্চক। ফের কেন? তোরা যে এতবড়ো নিরেট মূর্খ তা জানতুম না। আমাদের পিতামহ বিষ্কম্ভী কাঁকুড়ের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে খবর রাখিসনে বুঝি?

দ্বিতীয় যনূক। কাঁকুড়ের মধ্যে কেন?

পঞ্চক। আবার কেন? তোর যে ওই এক কেন-র জ্বালায় আমাকে অতিষ্ঠ করে তুললি।

তৃতীয় যূনক। আর খেঁসারির ডাল?

পঞ্চক। একবার কোন যুগে একটা খেঁসারিডালের গুঁড়ো উপবাসের দিন কোনো এক মস্ত বুড়োর ঠিক গোঁফের উপর পড়েছিল; তাতে তাঁর উপবাসের পুণ্যফল থেকে ষষ্টিসহস্র ভাগের এক ভাগ কম পড়ে গিয়েছিল; তাই তখনই সেইখানে দাঁড়িয়ে উঠে তিনি জগতের সমস্ত খেঁসারিডালের খেতের উপর অভিশাপ দিয়ে গেছেন। এতবড়ো তেজ! তোরা হলে কী করতিস বল দেখি!

প্রথম যূনক। আমাদের কথা বলো কেন? উপবাসের দিনে খেঁসারিডাল যদি গোঁফের উপর পর্যন্ত এগিয়ে আসে তা হলে তাকে আরো একটু এগিয়ে নিই।

পঞ্চক। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্যি করে বলিস — তোরা কি লোহার কাজ করে থাকিস?

প্রথম যূনক। লোহার কাজ করি বইকি, খুব করি।

পঞ্চক। রাম রাম! আমরা সনাতন কাল থেকে কেবল তামা-পিতলের কাজ করে আসছি। লোহা গলাতে

পারি কিন্তু সব দিন নয়। ষষ্ঠীর দিনে যদি মঙ্গলবার পড়ে তবেই স্নান করে আমরা হাপর ছুঁতে পারি কিন্তু তাই বলে লোহা পিটোনো সে তো হতেই পারে না।

প্রথম যূনক। কেন, লোহা কী অপরাধটা করেছে?

পঞ্চক। আরে ওটা যে লোহা সে তো তোকে মানতেই হবে।

প্রথম যূনক। তা তো হবে।

পঞ্চক। তবে আর কী — এই বুঝেনে না।

দ্বিতীয় যূনক। তবু একটা তো কারণ আছে।

পঞ্চক। কারণ নিশ্চয়ই আছে কিন্তু কেবল সেটা পুঁথির মধ্যে। আচ্ছা, তোদের মন্ত্র কেউ পড়ায়নি?

দ্বিতীয় যূনক। মন্ত্র! কীসের মন্ত্র?

পঞ্চক। এই মনে কর, যেমন বজ্রবিদারণ মন্ত্র — তট তট তোতয় তোতয় —

তৃতীয় যূনক। ওর মানে কী?

পঞ্চক। আবার! মানে! তোর আস্পর্ধা তো কম নয়। সব কথাতেই মানে! কেয়ূরী মন্ত্রটা জানিস?

প্রথম যূনক। না।

পঞ্চক। মরীচী?

প্রথম যূনক। না।

পঞ্চক। মহাশীতবতী?

প্রথম যূনক। না।

পঞ্চক। উষ্ণীষবিজয়?

প্রথম যূনক। না।

পঞ্চক। নাপিত ক্ষৌর করতে করতে যেদিন তোদের বাঁ গালে রক্ত পাড়িয়ে দেয় সেদিন করিস কী?

তৃতীয় যূনক। সেদিন নাপিতের দুই গালে চড় কষিয়ে দিই।

পঞ্চক। না রে না, আমি বলছি সেদিন নদী পার হবার দরকার হলে তোরা খেয়া নৌকোয় উঠতে পারিস?

তৃতীয় যূনক। খুব পারি।

পঞ্চক। ওরে, তোরা আমাকে মাটি করলি রে। আমি আর থাকতে পারছি নে। তোদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে সাহস হচ্ছে না। এমন জবাব যদি আর একটা শুনতে পাই তোদের বুকে করে পাগলের মতো নাচব, আমার জাতমান কিছুই থাকবে না। ভাই, তোরা সব কাজই করতে পাস? তোদের দাদাঠাকুর কিছুতেই তোদের মানা করে না?

সব কাজে হাত লাগাই মোরা, সব কাজেই।
বাধাবাঁধন নেই গো নেই।
দেখি, খুঁজি, বুঝি,
কেবল ভাঙি, গড়ি, যুঝি,
মোরা সব দেশেতেই বেড়াই ঘুরে সব সাজেই।
পারি, নাই বা পারি,
নাহয় জিতি কিংবা হারি,
যদি অমনিতে হাল ছাড়ি, মরি সেই লাজেই।
আপন হাতের জোরে
আমরা তুলি সৃজন করে,
আমরা প্রাণ দিয়ে ঘর বাঁধি, থাকি তার মাঝেই।

পঞ্চক। সর্বনাশ করলে রে — আমার সর্বনাশ করলে! আমার আর ভদ্রতা রাখলে না। এদের তালে তালে আমারও পা দুটো নেচে উঠছে। আমাকে সুদ্ধ এরা টানবে দেখছি। কোন্‌দিন আমিও লোহা পিটোব রে লোহা পিটোব — কিন্তু খেঁসারির ডাল — না না, পালা ভাই, পালা তোরা। দেখছিস না, পড়ব বলে পুঁথি সংগ্রহ করে এনেছি।

আর একদল যূনকের প্রবেশ

প্রথম যূনক। ও ভাই পঞ্চক, দাদাঠাকুর আসছে।

দ্বিতীয় যূনক। এখন রাখো তোমার পুঁথি, রাখো — দাদাঠাকুর আসছে।

দাদাঠাকুরের প্রবেশ

প্রথম যূনক। দাদাঠাকুর!

দাদাঠাকুর। কীরে?

দ্বিতীয় যূনক। দাদাঠাকুর!

দাদাঠাকুর। কী চাই রে?

তৃতীয় যুনক। কিছু চাই নে — একবার তোমাকে ডেকে নিচ্ছি।

পঞ্চক। দাদাঠাকুর!

দাদাঠাকুর। কী ভাই, পঞ্চক যে!

পঞ্চক। ওরা সবাই তোমায় ডাকছে, আমারও কেমন ডাকতে ইচ্ছে হল। যতই ভাবছি ওদের দলে মিশব না ততই আরো জড়িয়ে পড়ছি।

প্রথম যূনক। আমাদের দাদাঠাকুরকে নিয়ে আবার দল কীসের? উনি আমাদের সব দলের শতদল পদ্ম।

পঞ্চক। ও ভাই, তোদের দাদাঠাকুরকে নিয়ে তোরা তো দিনরাত মাতামাতি করছিস, একবার আমাকে ছেড়ে দে, আমি একটু নিরালায় বসে কথা কই। ভয় নেই, ওঁকে আমাদের অচলায়তনে নিয়ে গিয়ে কপাট দিয়ে রাখব না।

প্রথম যূনক। নিয়ে যাও না। সে তো ভালোই হয়। তা হলে কপাটের বাপের সাধ্য নেই বন্ধ থাকে। উনি গেলে তোমাদের অচলায়তনের পাথরগুলো সুদ্ধ নাচতে আরম্ভ করবে, পুঁথিগুলোর মধ্যে বাঁশি বাজবে।

পঞ্চক। দাদাঠাকুর, শুনছি আমাদের গুরু আসছেন।

দাদাঠাকুর। গুরু! কী বিপদ! ভারি উৎপাত করবে তা হলে তো।

পঞ্চক। একটু উৎপাত হলে যে বাঁচি। চুপচাপ থেকে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে।

দাদাঠাকুর। আচ্ছা বেশ, তোমার গুরু এলে তাকে দেখে নেওয়া যাবে। এখন তুমি আছ কেমন বলো তো?

পঞ্চক। ভয়ানক টানাটানির মধ্যে আছি ঠাকুর। মনে মনে প্রার্থনা করছি গুরু এসে যে দিকে হোক এক দিকে আমাকে ঠিক করে রাখুন — হয় এখানকার খোলা হাওয়ার মধ্যে অভয় দিয়ে ছাড়া দিন, নয় তো খুব কষে পুঁথি চাপা দিয়ে রাখুন; মাথা থেকে পা পর্যন্ত আগাগোড়া একেবারে সমান চ্যাপ্টা হয়ে যাই।

একদল যূনকের প্রবেশ

দাদাঠাকুর। কী রে, এত ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলি কেন?

প্রথম যূনক। চণ্ডককে মেরে ফেলেছে।

দাদাঠাকুর। কে মেরেছে?

দ্বিতীয় যূনক। স্থবিরপত্তনের রাজা।

পঞ্চক। আমাদের রাজা? কেন, মারতে গেল কেন?

দ্বিতীয় যূনক। স্থবিরক হয়ে ওঠবার জন্যে চণ্ডককে বনের মধ্যে এক পোড়ো মন্দিরে তপস্যা করছিল। ওদের রাজা মন্থরগুপ্ত সেই খবর পেয়ে তাকে কেটে ফেলেছে।

তৃতীয় যূনক। আগে ওদের দেশের প্রাচীর পঁয়ত্রিশ হাত উঁচু ছিল, এবার আশি হাত উঁচু করবার জন্যে লোক লাগিয়ে দিয়েছে, পাছে পৃথিবীর সব লোক লাফ দিয়ে গিয়ে হঠাৎ স্থবিরক হয়ে ওঠে।

চতুর্থ যূনক। আমাদের দেশ থেকে দশজন যূনক ধরে নিয়ে গেছে, হয়তো ওদের কালঝণ্টি দেবীর কাছে বলি দেবে।

দাদাঠাকুর। চলো তবে।

প্রথম যূনক। কোথায়?

দাদাঠাকুর। স্থবিরপত্তনে।

দ্বিতীয় যূনক। এখনই?

দাদাঠাকুর। হাঁ এখনই।

সকলে। ওরে, চল্ রে চল্।

দাদাঠাকুর। আমাদের রাজার আদেশ আছে ওদের পাপ যখন প্রাচীরের আকার ধরে আকাশের জ্যোতি আচ্ছন্ন করতে উঠবে তখন সেই প্রাচীর ধুলোয় লুটিয়ে দিতে হবে।

প্রথম যূনক। দেব ধুলোয় লুটিয়ে।

সকলে। দেব লুটিয়ে।

দাদাঠাকুর। ওদের সেই ভাঙা প্রাচীরের উপর দিয়ে রাজপথ তৈরি করে দেব।

সকলে। হাঁ, রাজপথ তৈরি করে দেব।

দাদাঠাকুর। আমাদের রাজার বিজয়রথ তার উপর দিয়ে চলবে।

সকলে। হাঁ, চলবে, চলবে।

পঞ্চক। দাদাঠাকুর, এ কী ব্যাপার?

প্রথম যূনক। চলো, পঞ্চক, তুমি চলো।

দাদাঠাকুর। না না, পঞ্চক না। যাও ভাই, তুমি তোমার অচলায়তনে ফিরে যাও। যখন সময় হবে দেখা হবে।

পঞ্চক। কী জানি ঠাকুর, যদিও আমি কোনো কর্মের না, তবুও ইচ্ছে করছে তোমাদের সঙ্গে ছুটে বেরিয়ে পড়ি।

দাদাঠাকুর। না পঞ্চক, না তোমার গুরু আসবেন, তুমি অপেক্ষা করো গে।

[প্রস্থান

৩

দর্ভকপল্লি

পঞ্চক ও দর্ভকদল

পঞ্চক। নির্বাসন, আমার নির্বাসনরে! বেঁচে গেছি, বেঁচে গেছি!

প্রথম দর্ভক। তোমাদের কী খেতে দেব ঠাকুর?

পঞ্চক। তোদের যা আছে তাই আমরা খাব।

দ্বিতীয় দর্ভক। আমাদের খাবার? সে কী হয়? সে যে সব ছোঁওয়া হয়ে গেছে।

পঞ্চক। সেজন্য ভাবিস নে ভাই। পেটের খিদে যে আগুন, সে কারও ছোঁয়া মানে না, সবই পবিত্র করে। ওরে, তোরা সকালবেলায় করিস কী বল তো। ষড়ক্ষরিত দিয়ে একবার ঘটশুদ্ধি করে নিবিনে?

তৃতীয় দর্ভক। ঠাকুর, আমরা নীচ দর্ভক জাত — আমরা ও সব কিছুই জানি নে। আজ কত পুরুষ ধরে এখানে বাস করে আসছি, কোনোদিন তো তোমাদের পায়ের ধুলো পড়েনি। আজ তোমাদের মন্ত্র পড়ে আমাদের বাপ-পিতামহকে উদ্ধার করে দাও ঠাকুর।

পঞ্চক। সর্বনাশ! বলিস কী? এখানেও মন্ত্র পড়তে হবে! তাহলে নির্বাসনের দরকার কী ছিল? তা, সকালবেলা

তোরা কী করিস বল তো?

প্রথম দর্ভক। আমরা শাস্ত্র জানি নে, আমরা নাম গান করি।

পঞ্চক। সে কী রকম ব্যাপার? শোনা দেখি একটা।

দ্বিতীয় দর্ভক। ঠাকুর, সে তুমি শুনে হাসবে।

পঞ্চক। আমিই তো ভাই, এতদিন লোক হাসিয়ে আসছি — তোরা আমাকেও হাসাবি — শুনেও মন খুশি হয়। কিন্তু ভাবিস নে — নির্ভয়ে শুনিয়ে দে।

প্রথম দর্ভক। আচ্ছা ভাই, আয় তবে — গান ধর।

গান

ও অকূলের কূল, ও অগতির গতি,
ও অনাথের নাথ, ও পতিতের পতি।
ও নয়নের আলো, ও রসনার মধু,
ও রতনের হার, ও পরানের বঁধু।
ও অপরূপ রূপ, ও মনোহর কথা,
ও চরমের সুখ, ও মরমের ব্যথা,
ও ভিখারির ধন, ও অবোলার বোল—
ও জনমের দোলা, ও মরণের কোল।

পঞ্চক। দে ভাই, আমার মন্ত্রতন্ত্র সব ভুলিয়ে দে, আমার বিদ্যাসাধ্যি সব কেড়ে নে, দে আমাকে তোদের ওই গান শিখিয়ে দে।

আচার্যের প্রবেশ

প্রথম দর্ভক। বাবাঠাকুর, আমাদের সমস্ত পাড়া আজ ত্রাণ পেয়ে গেল। এতদিন তোমার চরণধুলো তো এখানে পড়েনি।

আচার্য। সে আমার অভাগ্য, সে আমারই অভাগ্য।

দ্বিতীয় দর্ভক। বাবা, তোমার স্নানের জল কাকে দিয়ে তোলাব? এখানে তো —

আচার্য। বাবা, তোরাই তুলে আনবি।

প্রথম দর্ভক। আমরা তুলে আনব — সে কী হয়!

আচার্য। হাঁ বাবা, তোদের তোলা জলে আজ আমার অভিষেক হবে।

দ্বিতীয় দর্ভক। ওরে চল্ তবে ভাই চল্। আমাদের পাটলা নদী থেকে জল আনি গে।

[দর্ভকদলের প্রস্থান

পঞ্চক। মনে হচ্ছে যেন ভিজে মাটির গন্ধ পাচ্ছি, কোথায় যেন বর্ষা নেমেছে।

আচার্য। ওই, পঞ্চক শুনতে পাচ্ছ কি?

পঞ্চক। কী বলুন দেখি?

আচার্য। আমার মনে হচ্ছে যেন সুভদ্র কাঁদছে।

পঞ্চক। এখান থেকে কি শোনা যাবে? এ বোধ হয় আর কোনো শব্দ।

আচার্য। তা হবে পঞ্চক, আমি তার কান্না আমার বুকের মধ্যে করে এনেছি। তার কান্নাটা এমন করে আমাকে বেজেছে কেন জানো? সে যে কান্না রাখতে পারে না তবু কিছুতে মানতে চায় না সে কাঁদছে।

পঞ্চক। এতক্ষণে ওরা তাকে মহাতামসে বসিয়েছে — আর সকলে মিলে খুব দূরে থেকে বাহবা দিয়ে বলছে, সুভদ্র দেবশিশু। আর কিছু না, আমি যদি রাজা হতুম তাহলে ওদের সবাইকে কান ধরে দেবতা করে দিতুম — কিছুতে ছাড়তুম না।

আচার্য। ওরা ওদের দেবতাকে কাঁদাচ্ছে পঞ্চক। সেই দেবতারই কান্নায় এ রাজ্যের সকল আকাশ আকুল হয়ে উঠছে। তবু ওদের পাষাণের বেড়া এখনো শতধা বিদীর্ণ হয়ে গেল না।

দর্ভকদলের প্রবেশ

পঞ্চক। কী ভাই, তোরা এত ব্যস্ত কীসের?

প্রথম দর্ভক। শুনেছি অচলায়তনে কারা সব লড়াই করতে এসেছে।

আচার্য। লড়াই কীসের? আজ তো গুরুর আসবার কথা।

দ্বিতীয় দর্ভক। না না, লড়াই হচ্ছে খবর পেয়েছি। সমস্ত ভেঙে চুরে একাকার করে দিলে যে।

তৃতীয় দর্ভক। বাবাঠাকুর, তোমরা যদি হুকুম করো আমরা যাই ঠেকাই গিয়ে।

আচার্য। ওখানে তো লোক ঢের আছে, তোমাদের ভয় নেই বাবা।

প্রথম দর্ভক। লোক তো আছে, কিন্তু তারা লড়াই করতে পারবে কেন?

দ্বিতীয় দর্ভক। শুনেছি কতরকম মন্ত্রলেখা তাগাতাবিজ দিয়ে তারা দু-খানা হাত আগাগোড়া কষে বেঁধে রেখেছে। খোলে না, পাছে কাজ করতে গেলেই তাদের হাতের গুণ নষ্ট হয়।

পঞ্চক। আচার্যদেব, এদের সংবাদটা সত্যই হবে। কাল সমস্ত রাত মনে হচ্ছিল, চার দিকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন ভেঙে চুরে পড়ছে। ঘুমের ঘোরে ভাবুছিলুম, স্বপ্ন বুঝি।

আচার্য। তবে কি গুরু আসেননি?

পঞ্চক। হয়তো বা দাদা ভুল করে আমার গুরুরই সঙ্গে লড়াই বাধিয়ে বসেছেন! আটক নেই। রাত্রে তাঁকে হঠাৎ দেখে হয়তো যমদূত বলে ভুল করেছিলেন।

প্রথম দর্ভক। আমরা শুনেছি, কে বলছিল গুরুও এসেছেন।

আচার্য। গুরুও এসেছেন! সে কী রকম হল?

পঞ্চক। তবে লড়াই করতে কারা এসেছে বলো তো।

প্রথম দর্ভক। লোকের মুখে শুনি তাদের নাকি বলে, দাদাঠাকুরের দল।

পঞ্চক। দাদাঠাকুরের দল! বল্ বল্ শুনি, ঠিক বলছিস তো রে?

প্রথম দর্ভক। বাবাঠাকুর, হুকুম করো, একবার ওদের সঙ্গে লড়ে আসি — দেখিয়ে দিই, এখানে মানুষ আছে।

পঞ্চক। আয় না ভাই, আমিও তোদের সঙ্গে চলবরে।

দ্বিতীয় দর্ভক। তুমিও লড়বে নাকি ঠাকুর?

পঞ্চক। হাঁ লড়ব।

আচার্য। কী বলছ পঞ্চক! তোমাকে লড়তে কে ডাকছে?

মালীর প্রবেশ

মালী। আচার্যদেব, আমাদের গুরু আসছেন।

আচার্য। বলিস কী? গুরু? তিনি এখানে আসছেন? আমাকে আহ্বান করলেই তো আমি যেতুম।

প্রথম দর্ভক। এখানে তোমাদের গুরু এলে তাঁকে বসাব কোথায়?

দ্বিতীয় দর্ভক। বাবাঠাকুর, তুমি এখানে তাঁর বসবার জায়গাটাকে একটু শোধন করে নাও — আমরা তফাতে সরে যাই।

আর-একদল দর্ভকের প্রবেশ

প্রথম দর্ভক। বাবাঠাকুর, এ তোমাদের গুরু নয় — সে এ পাড়ায় আসবে কেন? এ যে আমাদের গোঁসাই।

দ্বিতীয় দর্ভক। আমাদের গোঁসাই?

প্রথম দর্ভক। হাঁ রে হাঁ, আমাদের গোঁসাই! এমন সাজ তার আর কখনো দেখিনি। একেবারে চোখ ঝলসে যায়।

তৃতীয় দর্ভক। ঘরে কী আছেরে ভাই, সব বের কর।

দ্বিতীয় দর্ভক। বনের জাম আছে রে।

চতুর্থ দর্ভক। আমার ঘরে খেজুর আছে।

প্রথম দর্ভক। কালো গোরুর দুধ শিগগির দুয়ে আন দাদা।

দাদাঠাকুরের প্রবেশ

আচার্য। (প্রণাম করিয়া) জয় গুরুজির জয়!

পঞ্চক। এ কী! এ যে দাদাঠাকুর! গুরু কোথায়?

দর্ভকদল। গোঁসাই ঠাকুর! প্রণাম হই। খবর দিয়ে এলে না কেন? তোমার ভোগ যে তৈরি হয়নি।

দাদাঠাকুর। কেন ভাই, তোদের ঘরে আজ রান্না চড়েনি নাকি? তোরাও মন্ত্র নিয়ে উপোস করতে আরম্ভ করেছিস না কিরে?

প্রথম দর্ভক। আমরা আজ শুধু মাষকলাই আর ভাত চড়িয়েছি। ঘরে আর কিছু ছিল না।

দাদাঠাকুর। আমারও তাতেই হয়ে যাবে।

পঞ্চক। দাদাঠাকুর, আমার ভারি গর্ব ছিল এ রাজ্যে একলা আমিই কেবল চিনি তোমাকে। কারও যে চিনতে আর বাকি নেই!

প্রথম দর্ভক। ওই তো আমাদের গোঁসাই — পূর্ণিমার দিনে এসে আমাদের পিঠে খেয়ে গেছে, তারপর এই কতদিন পরে দেখা। চল ভাই, আমাদের যা আছে সব সংগ্রহ করে আনি।

[প্রস্থান

দাদাঠাকুর। আচার্য, তুমি এ কী করেছ!

আচার্য। কী যে করেছি তা বোঝবারও শক্তি আমার নেই। তবে এইটুকু বুঝি — আমি সব নষ্টকরেছি।

দাদাঠাকুর। যিনি তোমাকে মুক্তি দেবেন তাঁকেই তুমি কেবল বাঁধবার চেষ্টা করেছ।

আচার্য। কিন্তু বাঁধতে তো পারিনি ঠাকুর। তাঁকে বাঁধছি মনে করে যতগুলো পাক দিয়েছি সব পাক কেবল নিজের চার দিকেই জড়িয়েছি। যে হাত দিয়ে সেই বাঁধন খোলা যেতে পারত সেই হাতটা সুদ্ধ বেঁধে ফেলেছি।

দাদাঠাকুর। যিনি সব জায়গায় আপনি ধরা দিয়ে বসে আছেন তাঁকে একটা জায়গায় ধরতে গেলেই তাঁকে হারাতে হয়।

আচার্য। আদেশ করো প্রভু। ভুল করেছিলুম জেনেও সে ভুল ভাঙতে পারিনি। পথ হারিয়েছি তা জানতুম, যতই চলছি ততই পথ হতে কেবল বেশি দূর গিয়ে পড়ছি তাও বুঝতে পেরেছিলুম, কিন্তু ভয়ে থামতে পারছিলুম না। এই চক্রে হাজার বার ঘুরে বেড়ানোকেই পথ খুঁজে পাবার উপায় বলে মনে করেছিলুম।

দাদাঠাকুর। যে চক্র কেবল অভ্যাসের চক্র, যা কোনো জায়গাতেই নিয়ে যায় না, কেবল নিজের মধ্যেই ঘুরিয়ে মারে, তার থেকেই বের করে সোজা রাস্তায় বিশ্বের সকল যাত্রীর সঙ্গে দাঁড় করিয়ে দেবার জন্যেই আমি আজ এসেছি।

আচার্য। ধন্য করেছ! — কিন্তু এতদিন আসনি কেন প্রভু? আমাদের আয়তনের পাশেই এই দর্ভকপাড়ায় তুমি আনাগোনা করছ, আর কত বৎসর হয়ে গেল আমাদের আর দেখা দিলে না।

দাদাঠাকুর। এদের দেখা দেওয়ার রাস্তা যে সোজা। তোমাদের সঙ্গে দেখা করা তো সহজ করে রাখনি।

পঞ্চক। ভালোই করেছি, তোমার শক্তি পরীক্ষা করে নিয়েছি। তুমি আমাদের পথ সহজ করে দেবে, কিন্তু তোমার পথ সহজ নয়। এখন, আমি ভাবছি তোমাকে ডাকব কী বলে? দাদাঠাকুর, না গুরু।

দাদাঠাকুর। যে জানতে চায় না, আমি তাকে চালাচ্ছি আমি তার দাদাঠাকুর, আর যে আমার আদেশ নিয়ে চলতে চায় আমি তার গুরু।

পঞ্চক। প্রভু, তুমি তাহলে আমার দুইই। আমাকে আমিই চালাচ্ছি আর আমাকে তুমিই চালাচ্ছ, এই দুটোই আমি মিশিয়ে জানতে চাই। আমি তো যূনক নই, তোমাকে মেনে চলতে ভয় নেই। তোমার মুখের আদেশকেই আনন্দে আমার মনের ইচ্ছা করে তুলতে পারব। এবার তবে তোমার সঙ্গে তোমারই বোঝা মাথায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ি ঠাকুর।

দাদাঠাকুর। আমি তোমার জায়গা ঠিক করে রেখেছি।

পঞ্চক। কোথায় ঠাকুর?

দাদাঠাকুর। ওই অচলায়তনে।

পঞ্চক। আবার অচলায়তনে? আমার কারদণ্ডের মেয়াদ ফুরোয়নি?

দাদাঠাকুর। কারাগার যা ছিল সে তো আমি ভেঙে ফেলেছি, এখন সেই উপকরণ দিয়ে সেইখানেই তোমাকে মন্দির গেঁথে তুলতে হবে।

পঞ্চক। কিন্তু অচলায়তনের লোকে যে আমাকে আপন বলে গ্রহণ করবে না প্রভু।

দাদাঠাকুর। ওরা তোমাকে গ্রহণ করতে চাচ্ছে না, সেইজন্যেই ওখানে তোমার সবচেয়ে দরকার। ওরা তোমাকে ঠেলে দিচ্ছে বলেই তুমি ওদের ঠেলতে পারবে না।

পঞ্চক। আমাকে কী করতে হবে?

দাদাঠাকুর। যে যেখানে ছড়িয়ে আছে সবাইকে ডাক দিয়ে আনতে হবে।

পঞ্চক। সবাইকে কি কুলোবে?

দাদাঠাকুর। না যদি কুলোয় তা হলে দেয়াল আর একদিন ভাঙতেই হবে। আমি এখন চললুম অচলায়তনের দ্বার খুলতে।

[প্রস্থান

৪

অচলায়তন

মহাপঞ্চক, সঞ্জীব, বিশ্বম্ভর, জয়োত্তম

মহাপঞ্চক। তোমরা এত ব্যস্ত হয়ে পড়ছ কেন? কোনো ভয় নেই।

বিশ্বম্ভর। তুমি তো বলছ ভয় নেই, এই যে খবর এল, শত্রুসৈন্য অচলায়তনের প্রাচীর ফুটো করে দিয়েছে।

মহাপঞ্চক। এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। শিলা জলে ভাসে! ম্লেচ্ছরা অচলায়তনের প্রাচীর ফুটো করে দেবে! পাগল হয়েছ?

সঞ্জীব। কে যে বললে দেখে এসেছে।

মহাপঞ্চক। সে স্বপ্ন দেখেছে।

জয়োত্তম। আজই তো আমাদের গুরুর আসবার কথা।

মহাপঞ্চক। তাঁর জন্যে সমস্ত আয়োজন ঠিক হয়ে গেছে; কেবল যে ছেলের মা-বাপ, ভাই-বোন কেউ মরেনি এমন নবম গর্ভের সন্তান এখনো জুটিয়ে আনতে পারলে না — দ্বারে দাঁড়িয়ে কে যে মহারক্ষা পড়বে ঠিক করতে পারছিনে।

সঞ্জীব। গুরু এলে তাঁকে চিনে নেবে কে? আচার্য অদীনপুণ্য তাঁকে জানতেন। আমরা তো কেউ তাঁকে দেখিনি।

মহাপঞ্চক। আমাদের আয়তনে যে শাঁখ বাজায় সেই বৃদ্ধ তাঁকে দেখেছে। আমাদের পূজার ফুল যে জোগায় সেও তাঁকে জানে।

বিশ্বম্ভর। ওই যে উপাধ্যায় ব্যস্ত হয়ে ছুটে আসছেন।

মহাপঞ্চক। নিশ্চয় গুরু আসার সংবাদ পেয়েছেন। কিন্তু মহারক্ষা পাঠের কী করা যায়। ঠিক লক্ষণসম্পন্ন ছেলে তো পাওয়া গেল না।

উপাধ্যায়ের প্রবেশ

মহাপঞ্চক। কত দূর?

উপাধ্যায়। কত দূর কী? এসে পড়েছে যে।

মহাপঞ্চক। কই দ্বারে তো এখনো শাঁখ বাজালে না?

উপাধ্যায়। বিশেষ দরকার দেখিনে— কারণ দ্বারের চিহ্নও দেখতে পাচ্ছিনে — ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

মহাপঞ্চক। বলো কী, দ্বার ভেঙেছে?

উপাধ্যায়। শুধু দ্বার নয়, প্রাচীরগুলোকে এমনি সমান করে শুইয়ে দিয়েছে যে তাদের সম্বন্ধে আর কোনো চিন্তা করবার দরকার নেই। ওই দেখছ না আলো।

মহাপঞ্চক। কিন্তু আমাদের দৈবজ্ঞ যে গণনা করে স্পষ্ট দেখিয়ে দিয়ে গেল যে —

উপাধ্যায়। তার চেয়ে ঢের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে শত্রুসৈন্যদের রক্তবর্ণ টুপিগুলো। এই যে সব ফাঁক হয়ে গেছে।

ছাত্রগণ। কী সর্বনাশ!

সঞ্জীব। কীসের মন্ত্র তোমার মহাপঞ্চক?

বিশ্বম্ভর। আমি তো তখনই বলেছিলুম, এসব কাজ এই কাঁচা বয়সের পুঁথিপড়া অকালপক্বদের দিয়ে হবার নয়।

সঞ্জীব। কিন্তু এখন করা যায় কী?

জয়োত্তম। আমাদের আচার্যদেবকে এখনই ফিরিয়ে আনি গে। তিনি থাকলে এ বিপত্তি ঘটতেই পারত না। হাজার হোক লোকটা পাকা।

সঞ্জীব। কিন্তু দেখো মহাপঞ্চক, আমাদের আয়তনের যদি কোনো বিপত্তি ঘটে তা হলে তোমাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলব।

উপাধ্যায়। সে পরিশ্রমটা তোমাদের করতে হবে না, উপযুক্ত লোক আসছে।

মহাপঞ্চক। তোমরা মিথ্যা বিচলিত হচ্ছ। বাইরের প্রাচীর ভাঙতে পারে, কিন্তু ভিতরের লোহার দরজা বন্ধ আছে। সে যখন ভাঙবে তখন চন্দ্রসূর্য নিবে যাবে। আমি অভয় দিচ্ছি তোমরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে অচলায়তনের রক্ষক-দেবতার আশ্চর্য শক্তি দেখে নাও।

উপাধ্যায়। তার চেয়ে দেখি কোন দিক দিয়ে বেরোবার রাস্তা।

বিশ্বম্ভর। আমাদেরও তো সেই ইচ্ছা। কিন্তু এখান থেকে বেরোবার পথ যে জানিই নে। কোনোদিন বেরোতে হবে বলে স্বপ্নেও মনে করিনে।

সঞ্জীব। শুনছ—ওই শুনছ, ভেঙে পড়ল সব।

ছাত্রগণ। কী হবে আমাদের। নিশ্চয় দরজা ভেঙেছে। এই যে একেবারে নীল আকাশ।

বালকদলের প্রবেশ

উপাধ্যায়। কীরে তোরা সব নৃত্য করছিস কেন?

প্রথম বালক। আজ এ কী মজা হল।

উপাধ্যায়। মজাটা কী রকম শুনি?

দ্বিতীয় বালক। আজ চার দিক থেকেই আলো আসছে—সব যেন ফাঁক হয়ে গেছে।

তৃতীয় বালক। এত তো আমরা কোনোদিন দেখিনি।

প্রথম বালক। কোথাকার পাখির ডাক এখান থেকেই শোনা যাচ্ছে।

দ্বিতীয় বালক। এসব পাখির ডাক আমরা তো কোনোদিন শুনিনি। এ তো আমাদের খাঁচার ময়নার মতো একেবারেই নয়।

প্রথম বালক। আজ আমাদের খুব ছুটতে ইচ্ছে করছে। তাতে কি দোষ হবে মহাপঞ্চকদাদা?

মহাপঞ্চক। আজকের কথা ঠিক বলতে পারছি নে। আজ কোনো নিয়ম রক্ষা করা চলবে বলে বোধ হচ্ছে না।

প্রথম বালক। আজ তা হলে আমাদের ষড়াসন বন্ধ?

মহাপঞ্চক। হাঁ, বন্ধ।

সকলে। ওরে কী মজারে কী মজা।

দ্বিতীয় বালক। আজ পঙ্‌ক্তি ধৌতির দরকার নেই?

মহাপঞ্চক। না।

সকলে। ওরে কী মজা। আঃ আজ চার দিকে কী আলো।

জয়োত্তম। আমারও মনটা নেচে উঠেছে বিশ্বম্ভর! এ কী ভয়, না আনন্দ, কিছুই বুঝতে পারছিনে।

বিশ্বম্ভর। আজ একটা অদ্ভুত কাণ্ড হচ্ছে জয়োত্তম।

সঞ্জীব। কিন্তু ব্যাপারটা যে কী, ভেবে উঠতে পারছিনে। ওরে ছেলেগুলো, তোরা হঠাৎ এত খুশি হয়ে উঠলি কেন বল দেখি।

প্রথম বালক। দেখছ না, সমস্ত আকাশটা যেন ঘরের মধ্যে দৌড়ে এসেছে।

দ্বিতীয় বালক। মনে হচ্ছে ছুটি—আমাদের ছুটি।

[বালকদের প্রস্থান

জয়োত্তম। দেখো মহাপঞ্চকদাদা, আমার মনে হচ্ছে ভয় কিছুই নেই—নইলে ছেলেদের মন এমন অকারণে খুশি হয়ে উঠল কেন?

মহাপঞ্চক। ভয় নেই সে তো আমি বরাবর বলে আসছি।

শঙ্খবাদক ও মালীর প্রবেশ

উভয়ে। গুরু আসছেন।

সকলে। গুরু!

মহাপঞ্চক। শুনলে তো। আমি নিশ্চয় জানতুম তোমাদের আশঙ্কা বৃথা।

সকলে। ভয় নেই আর ভয় নেই।

বিশ্বম্ভর। মহাপঞ্চক যখন আছেন তখন কি আমাদের ভয় থাকতে পারে।

সকলে। জয় আচার্য মহাপঞ্চকের।

যোদ্ধৃবেশে দাদাঠাকুরের প্রবেশ

শঙ্খবাদক ও মালী। (প্রণাম করিয়া) জয় গুরুজির জয়!

সকলে স্তম্ভিত

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, এই কি গুরু?

উপাধ্যায়। তাই তো শুনছি।

মহাপঞ্চক। তুমি কি আমাদের গুরু?

দাদাঠাকুর। হাঁ! তুমি আমাকে চিনবে না, কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু।

মহাপঞ্চক। তুমি গুরু? তুমি আমাদের সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে এ কোন পথ দিয়ে এলে? তোমাকে কে মানবে?

দাদাঠাকুর। আমাকে মানবে না জানি, কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু।

মহাপঞ্চক। তুমি গুরু? তবে এই শত্রুবেশে কেন?

দাদাঠাকুর। এই তো আমার গুরুর বেশ। তুমি যে আমার সঙ্গে লড়াই করবে—সেই লড়াই আমার গুরুর অভ্যর্থনা।

মহাপঞ্চক। কেন তুমি আমাদের প্রাচীর ভেঙে দিয়ে এলে?

দাদাঠাকুর। তুমি কোথাও তোমার গুরুর প্রবেশের পথ রাখোনি।

মহাপঞ্চক। তুমি কি মনে করেছ তুমি অস্ত্র হাতে করে এসেছ বলে আমি তোমার কাছে হার মানব?

দাদাঠাকুর। না, এখনই না। কিন্তু দিনে দিনে হার মানতে হবে, পদে পদে।

মহাপঞ্চক। আমাকে নিরস্ত্র দেখে ভাবছ আমি তোমাকে আঘাত করতে পারি নে?

দাদাঠাকুর। আঘাত করতে পারো কিন্তু আহত করতে পারো না—আমি যে তোমার গুরু।

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, তোমরা এঁকে প্রণাম করবে নাকি?

উপাধ্যায়। দয়া করে উনি যদি আমাদের প্রণাম গ্রহণ করেন তা হলে প্রণাম করব বইকি—তা নইলে যে—

মহাপঞ্চক। না, আমি তোমাকে প্রণাম করব না।

দাদাঠাকুর। আমি তোমার প্রণাম গ্রহণ করব না—আমি তোমাকে প্রণত করব।

মহাপঞ্চক। তুমি আমাদের পূজা নিতে আসনি?

দাদাঠাকুর। আমি তোমাদের পূজা নিতে আসিনি, অপমান নিতে এসেছি।

মহাপঞ্চক। তোমার পশ্চাতে অস্ত্রধারী এ কারা?

দাদাঠাকুর। এরা আমার অনুবর্তী — এরা যূনক।

সকলে। যূনক!

মহাপঞ্চক। এরাই তোমার অনুবর্তী?

দাদাঠাকুর। হাঁ।

মহাপঞ্চক। এই মন্ত্রহীন কর্মকাণ্ডহীন ম্লেচ্ছদল! আমি এই আয়তনের আচার্য—আমি তোমাকে আদেশ করছি তুমি এখনই ওই ম্লেচ্ছদলকে সঙ্গে নিয়ে বাহির হয়ে যাও।

দাদাঠাকুর। আমি যাকে আচার্য নিযুক্ত করব সেই আচার্য; আমি যা আদেশ করব সেই আদেশ।

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, আমরা এমন করে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। এসো আমরা এদের এখান থেকে বাহির করে দিয়ে আমাদের আয়তনের সমস্ত দরজাগুলো আবার একবার দ্বিগুণ দৃঢ় করে বন্ধ করি।

উপাধ্যায়। এরাই আমাদের বাহির করে দেবে, সেই সম্ভাবনাটাই প্রবল বলে বোধ হচ্ছে।

প্রথম যূনক। অচলায়তনের দরজার কথা বলছ—সে আরো আকাশের সঙ্গে দিব্যি সমান করে দিয়েছি।

উপাধ্যায়। বেশ করেছ ভাই। আমাদের ভারি অসুবিধা হচ্ছিল। এত তালাচাবির ভাবনাও ভাবতে হত।

মহাপঞ্চক। পাথরের প্রাচীর তোমরা ভাঙতে পারো, লোহার দরজা তোমরা খুলতে পারো, কিন্তু আমি আমার ইন্দ্রিয়ের সমস্ত দ্বার রোধ করে এই বসলুম—যদি প্রায়োপবেশনে মরি তবু তোমাদের হাওয়া তোমাদের আলো লেশমাত্র আমাকে স্পর্শ করতে দেব না।

প্রথম যূনক। এই পাগলটা কোথাকার রে। এই তলোয়ারের ডগা দিয়ে ওর মাথার খুলিটা ফাঁক করে দিলে ওর বুদ্ধিতে একটু হাওয়া লাগতে পারে।

মহাপঞ্চক। কীসের ভয় দেখাও আমায়। তোমরা মেরে ফেলতে পারো, তার বেশি ক্ষমতা তোমাদের নেই।

প্রথম যূনক। ঠাকুর, এই লোকটাকে বন্দি করে নিয়ে যাই—আমাদের দেশের লোকের ভারি মজা লাগবে।

দাদাঠাকুর। ওকে বন্দি করবে তোমরা? এমন কী বন্ধন তোমাদের হাতে আছে।

দ্বিতীয় যূনক। ওকে কি কোনো শাস্তিই দেব না?

দাদাঠাকুর। শাস্তি দেবে! ওকে স্পর্শ করতেও পারবে না। ও আজ যেখানে বসেছে সেখানে তোমাদের তলোয়ার পৌঁছায় না।

বালকদলের প্রবেশ

সকলে। তুমি আমাদের গুরু?

দাদাঠাকুর। হাঁ, আমি তোমাদের গুরু।

সকলে। আমরা প্রণাম করি।

দাদাঠাকুর। বৎস, তোমরা মহাজীবন লাভ করো।

প্রথম বালক। ঠাকুর, তুমি আমাদের কী করবে?

দাদাঠাকুর। আমি তোমাদের সঙ্গে খেলব।

সকলে। খেলবে?

দাদাঠাকুর। নইলে তেমাদের গুরু হয়ে সুখ কীসের?

সকলে। কোথায় খেলবে?

দাদাঠাকুর। আমার খেলার মস্ত মাঠ আছে।

প্রথম বালক। মস্ত! এই ঘরের মতো মস্ত?

দাদাঠাকুর। এর চেয়ে অনেক বড়ো।

দ্বিতীয় বালক। এর চেয়েও বড়ো? ওই আঙিনাটার মতো?

দাদাঠাকুর। তার চেয়ে বড়ো।

দ্বিতীয় বালক। তার চেয়ে বড়ো! উঃ কী ভয়ানক!

প্রথম বালক। সেখানে খেলতে গেলে পাপ হবে না?

দাদাঠাকুর। কীসের পাপ?

দ্বিতীয় বালক। খোলা জায়গায় গেলে পাপ হয় না?

দাদাঠাকুর। খোলা জায়গাতেই সব পাপ পালিয়ে যায়।

সকলে। কখন নিয়ে যাবে?

দাদাঠাকুর। এখানকার কাজ শেষ হলেই।

জয়োত্তম। (প্রণাম করিয়া) প্রভু, আমিও যাব।

বিশ্বম্ভর। সঞ্জীব, আর দ্বিধা করলে কেবল সময় নষ্ট হবে। প্রভু, ওই বালকের সঙ্গে আমাদেরও ডেকে নাও।

সঞ্জীব। মহাপঞ্চকদাদা, তুমিও এসো না।

মহাপঞ্চক। না, আমি না।

সুভদ্রের প্রবেশ

সুভদ্র। গুরু!

দাদাঠাকুর। কী বাবা।

সুভদ্র। আমি যে পাপ করেছি তার তো প্রায়শ্চিত্ত শেষ হল না।

দাদাঠাকুর। তার আর কিছু বাকি নেই।

সুভদ্র। বাকি নেই?

দাদাঠাকুর। না আমি সমস্ত চুরমার করে ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছি।

সুভদ্র। একজটা দেবী—

দাদাঠাকুর। একজটা দেবী! উত্তরের দিকের দেয়ালটা ভাঙবামাত্রই একজটা দেবীর সঙ্গে আমাদের এমনি মিল হয়ে গেল যে সে আর কোনো দিন জটা দুলিয়ে কাউকে ভয় দেখাবে না। এখন তাকে দেখলে মনে হবে সে আকাশের আলো—তার সমস্ত জটা আষাঢ়ের নবীন মেঘের মধ্যে জড়িয়ে গিয়েছে।

সুভদ্র। এখন আমি কী করব?

পঞ্চক। এখন তুমি আছ ভাই, আর আমি আছি। দুজনে মিলে কেবলই উত্তর দক্ষিণ পুব-পশ্চিমের সমস্ত দরজা জালনাগুলো খুলে খুলে বেড়াব।

যূনক ও দর্ভকদলের প্রবেশ ও গুরুকে প্রদক্ষিণ করিয়া গান

ভেঙেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়
তোমারি হউক জয়।
তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়,
তোমারি হউক জয়।
হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে,
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে,
বন্ধন হোক ক্ষয়
তোমারি হউক জয়।
এসো দুঃসহ, এসো এসো নির্দয়,
তোমারি হউক জয়।
এসো নির্মল, এসো এসো নির্ভয়,
তোমারি হউক জয়।
প্রভাতসূর্য, এসেছ রুদ্রসাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য বাজে,
অরুণবহ্নি জ্বালাও চিত্তমাঝে
মৃত্যুর হোক লয়।
তোমারি হউক জয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১—১৯৪১) : জন্ম কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত *ভারতী* ও *বালক* পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। সংগীত, নাট্যচর্চার ঐতিহ্য ও আবহে তিনি আশৈশব লালিত হয়েছেন। দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিভিন্ন নাটকের প্রয়োজনে তিনি কিশোর বয়স থেকেই সংগীত রচনা, সুরারোপ এবং অভিনয় করেছেন। পরবর্তীকালে তাঁর লেখা নাটকগুলিতেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে গান। তাঁর নাটকগুলির মধ্যে রয়েছে *রাজা, ডাকঘর, ফাল্গুনী, মুক্তধারা, রক্তকরবী, কালের যাত্রা, তাসের দেশ প্রভৃতি*। দীর্ঘ জীবনে তিনি প্রচুর কবিতা, গান, ছোটোগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ লিখেছেন, ছবি এঁকেছেন। এশিয়ার মধ্যে তিনিই প্রথম *নোবেল* পুরস্কার পান ১৯১৩ সালে *Song Offerings* কাব্যগ্রন্থের জন্যে। তাঁর রচিত গান; দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র— ভারত আর বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

প্রসঙ্গত :

'গুরু' নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩২৪ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে (ফেব্রুয়ারি ১৯১৮)। গ্রন্থটি প্রকাশ করেন প্রিয়নাথ দাসগুপ্ত 'ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস'-এর পক্ষ থেকে। গ্রন্থসূচনায় রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন, 'সহজে অভিনয়যোগ্য করিবার অভিপ্রায়ে অচলায়তন নাটকটি ''গুরু'' নামে এবং কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত এবং লঘুতর আকারে প্রকাশ করা হইল।'

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে 'অচলায়তন' নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৩১৯ বঙ্গাব্দে (১৯১২)। ১৩১৮ সালে রবীন্দ্রনাথ নাটকটি পাঠ করে কয়েকজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-বন্ধুকে শোনান। সেই পাঠসভার স্মৃতিচারণে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন (রবিরশ্মি, ২, পৃ. ১৪০) :

'প্রথমে যেদিন অচলায়তন নাটক পাঠ করেন, সেদিনই উহার নাম ''গুরু'' রাখিবার ইচ্ছা কবি প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা ''অচলায়তন'' নামটিকেই অধিক সমর্থন করাতে তাহাই বহাল থাকিয়াছিল।'

'অচলায়চন' এবং 'গুরু' দুটি নাটকেই পঞ্চক এবং মহাপঞ্চক চরিত্র দুটি আছে। এই চরিত্র দুটি এবং কাহিনিক্রমের ইঙ্গিত সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্রের *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* বইটি থেকে (P-309)। কাহিনিটি সেখানে ছিল এরকম :

A Brahman was one day seated in a very sorrowful mood, with one of his cheeks resting on his palm. An old woman asked him the cause. The Brahman told her his wife was *enciente,* and expected to be delivered soon, and as all his former sons had died immediately after birth, he expected the same calamity soon. The woman said, "Send for me when she is about to be confined, and I will help you." On the day of delivery the old woman came, helped the patient, took the male child in her arms, filled his mouth with butter, covered it with a white cloth, and handing him to a maid-servant, said, "Take this child to the market place, and standing on the crossing, say to every Brahman or Sramana you meet, 'this child salutes you'. When the sun sets bring him back." This was done, and the child lived. He was named Mahapanchaka. A second son was born, and he was saved in the same way. His name was Panchaka. After the death of the Brahman, Mahapanchaka became a hermit, and was soon raised to the rank of an Arhat. Panchaka was a stupid youth and could learn nothing, so his brother expelled him from the monastery, and he sat crying on the roadside. The Lord met him in the condition, directed a hermit to instruct him, and soon after ordained an Arhat.

(এক ব্রাহ্মণ একদিন মনের দুঃখে গালে হাত দিয়ে বসেছিল। কোথা থেকে এক বুড়ি এসে জিজ্ঞেস করল, কেন তোর এত চিন্তা? ব্রাহ্মণ বলল, আমার বউ আঁতুড়ঘরে যাবে, কিন্তু এবারও আমার সন্তান বাঁচবে না। আগে কয়েকবার ছেলে জন্মেই মারা গেছে। বুড়ি বলল, 'আঁতুড়ে ঢুকলে আমায় খবর দিও। আমি সাহায্য করব।' ব্রাহ্মণীর যেদিন সন্তান হবে, খবর দেওয়া হল সেই বুড়িকে। নিপুণভাবে সেই বুড়ি দাই-মায়ের ভূমিকা পালন করল, তারপর সদ্যোজাত ছেলেটির মুখে মাখন ঢুকিয়ে সাদা কাপড়ে ঢেকে পরিচারিকার হাতে তুলে বলল, 'ওকে এবার বাজারচত্বরে নিয়ে যাও, মোড়ে দাঁড়িয়ে কোনো ব্রাহ্মণ বা

শ্রমণ দেখলেই বলবে, ''এই শিশু আপনাকে প্রণাম জানায়'' আর সূর্যাস্তের সময় একে ফিরিয়ে এনো বাড়িতে।' সেরকমই করা হল। শিশুটিও দিব্যি বেঁচে রইল। তার নাম দেওয়া হল মহাপঞ্চক। ব্রাহ্মণের আবার একটি পুত্র হল। একইভাবে তার মৃত্যুকে রুখে দেওয়া গেল। এই ছেলেটির নাম হল পঞ্চক। ব্রাহ্মণের আয়ু শেষ হল। মহাপঞ্চক কালে কালে হল এক সন্ন্যাসী, ক্রমে উন্নীত হল অর্হৎ পর্যায়ে। পঞ্চক হয়ে রইল এক নির্বোধ যুবক, যে কিছুই শিখতে পারল না। তখন মহাপঞ্চক তাকে বৌদ্ধমন্দির থেকে তাড়িয়ে দিল। পঞ্চক রাস্তার ধারে বসে কান্নাকাটি করছিল এমন সময় প্রভু তাকে দেখে এক সন্ন্যাসীকে দায়িত্ব দেন পঞ্চককে। পঞ্চক সেই সাধনায় ক্রমে অর্হৎ হয়ে ওঠে।)

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'রবীন্দ্র রচনাবলি' (ষোড়শ খণ্ড), গ্রন্থপরিচয় অংশে বলা হয়েছে :

'অচলায়তন' ছিল ৬ দৃশ্যের নাটক, 'গুরু'তে দৃশ্যসংখ্যা ৪। 'অচলায়তন'-এ গানের সংখ্যা ২৩, 'গুরু'তে ৭। এই ৭টি গানের মধ্যে 'ভেঙেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়' নতুন সংযোজন। বাকি ৬টি 'অচলায়তন'-এ ছিল, যদিও একই পারম্পর্যে নয়। আর 'অচলায়তন'-এর এই গানগুলি বর্জিত হয়েছে 'গুরু'তে : দূরে কোথায়; কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে; ঘরেতে ভ্রমর এল; এই একলা মোদের দাদাঠাকুর; যা হবার তা হবে; আমি কারে ডাকি গো; বুঝি এল; আজ যেমন করে গাইছে আকাশ; হারে, রে রে রে রে; এই মৌমাছিদের; আমরা তারেই জানি; সকল জনম ভ'রে; উতল ধারা বাদল ঝরে; আলো আমার আলো; যিনি সকল কাজের কাজি; আমি যে সব নিতে চাই; আর নহে আর নয়।

'সহজে অভিনয়যোগ্য' করবার উদ্দেশ্যে পরিবর্তিত হলেও নাটকের এই রূপটি শান্তিনিকেতনে সচরাচর অভিনীত হত না বলেই ব্যক্তিগত সাক্ষ্যে জানিয়েছিলেন প্রমথনাথ বিশী। যদিও, 'অচলায়তন' কেটে 'গুরু'র যে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়েছিল (Ms 230) সেখানেই রবীন্দ্রনাথ সম্ভাব্য অভিনেতাদের নামের একটা তালিকা সাজাচ্ছিলেন। পৃষ্ঠার ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত এলোমেলোভাবে ছড়ানো সেই পরিকল্পনা ছিল এইরকম :

পঞ্চক	আমি
মহাপঞ্চক	অবন
আচার্য	গগন/রথী
উপাধ্যায়	অসিত
গুরু	গগন
সুভদ্র	নেপু কিংবা গবা কিংবা খুকি
উপাচার্য	মণিলাল

হিরণ্ময় সমর নবু অজিত যামিনীর ছেলে সুকুমার প্রশান্ত ছোটকু খোদন

এরকম কোনো অভিনয় অবশ্য হতে পারেনি।

প্রায় দশ বছর পরে, প্রভাতকুমারের বর্ণনা অনুযায়ী ('রবীন্দ্রজীবনী' ৩, পৃ. ৩৬৩), ১৯২৮ সালের পূজাবকাশের আগে 'গুরু' নাটকটিই 'ছাত্র-শিক্ষকে মিলিয়া সিংহসদনে অভিনয় করিলেন, সেখানে তাঁহার (রবীন্দ্রনাথের) প্রেরণা আছে — অভিনয়েও উপস্থিত হইয়া সকলের আনন্দবর্ধন করেন।'

পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যসূচি

বাংলা - ক পাঠক্রমের পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যসূচি

গল্প

১.	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	.....	দুর্বুদ্ধি, বিদূষক, কর্তার ভূত
২.	প্রেমেন্দ্র মিত্র	.....	তেলেনাপোতা আবিষ্কার
৩.	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	.....	কে বাঁচায়, কে বাঁচে
৪.	তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়	.....	স্বাধীনতা
৫.	আশাপূর্ণা দেবী	.....	ত্রাণকর্তা
৬.	পরশুরাম	.....	পরশপাথর
৭.	সতীনাথ ভাদুড়ী	.....	ডাকাতের মা
৮.	বনফুল	.....	বন্য মহিষ
৯.	মহাশ্বেতা দেবী	.....	ভাত
১০.	সমরেশ বসু	.....	পশারিণী
১১.	সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ	.....	ভারতবর্ষ
১২.	মতি নন্দী	.....	অস্থায়ী পলায়ন
১৩.	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	.....	লেখিকা
১৪.	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	.....	শাজাহান আর তার নিজস্ব বাহিনী
১৫.	শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়	.....	সম্পূর্ণতা

প্রবন্ধ

১.	হুতোম প্যাঁচা	.....	ভূত নাবানো
২.	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	.....	কমলাকান্তের জোবানবন্দী
৩.	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	.....	কৌতুকহাস্য, নবযুগ, বিদ্যার যাচাই, সভ্যতার সংকট
৪.	সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	.....	জগতের শ্রেষ্ঠ বই
৫.	আব্দুল জব্বার	.....	ধানের নাম লক্ষ্মী
৬.	সত্যেন্দ্রনাথ বসু	.....	গালিলিও
৭.	অশীন দাশগুপ্ত	.....	রবি ঠাকুরের দল/সহিষ্ণুতার ইতিহাস
৮.	সৈয়দ মুজতবা আলি	.....	নেতাজী

৯.	কল্যাণী দত্ত	.....	আম
১০.	কাজী নজরুল ইসলাম	.....	ক্ষুদিরামের মা
১১.	নবনীতা দেবসেন	.....	দামাস্কাসের গেট (অংশ)
১২.	স্বামী বিবেকানন্দ	.....	সুয়েজখালে : হাঙ্গর শিকার
১৩.	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	.....	ঘরোয়া (অংশ)
১৪.	প্রমথ চৌধুরী	.....	সুরের কথা
১৫.	বিনয় ঘোষ	.....	হাসি
১৬.	শান্তিদেব ঘোষ	.....	বাংলাদেশের যাত্রাভিনয়

ভারতীয় গল্প

১.	কর্তার সিংহ দুগ্‌গাল	.....	অলৌকিক
২.	ইসমত চুগতাই	.....	বাচ্চা

আন্তর্জাতিক গল্প

১.	গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ	.....	বিশাল ডানাওয়ালা এক থুরথুরে বুড়ো
২.	আন্তন চেকভ	.....	কেরানির মৃত্যু

কবিতা

১.	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	.....	বীরাঙ্গনা, সনেট (বটবৃক্ষ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)
২.	লালন ফকির	.....	বাড়ির কাছে আরশিনগর
৩.	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	.....	রুপনারানের কূলে/আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে/ প্রাণ/ ঝড়ের খেয়া/ আধোজাগা
৪.	কাজী নজরুল ইসলাম	.....	বিদ্রোহীর বাণী, অরুনকান্তি কে গো, দ্বীপান্তরের বন্দিনী
৫.	জীবনানন্দ দাশ	.....	শিকার, তিমির হননের গান, আলোপৃথিবী
৬.	অমিয় চক্রবর্তী	.....	বিনিময়
৭.	বিষ্ণু দে	.....	স্বহস্তে বাজাবে
৮.	বুদ্ধদেব বসু	.....	বাবার চিঠি
৯.	সমর সেন	.....	মহুয়ার দেশ
১০.	সুভাষ মুখোপাধ্যায়	.....	আমরা যাবো, পারাপার
১১.	নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	.....	দেশ দেখাচ্ছ অন্ধকারে

১২.	অরুণ মিত্র	.....	তোমার মূর্তি আমি
১৩.	শঙ্খ ঘোষ	.....	দ
১৪.	অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত	.....	নির্বাসন
১৫.	শক্তি চট্টোপাধ্যায়	.....	আমি দেখি
১৬.	ভাস্কর চক্রবর্তী	.....	জিরাফ
১৭.	মৃদুল দাশগুপ্ত	.....	ক্রন্দনরতা জননীর পাশে
১৮.	জয় গোস্বামী	.....	নুন
১৯.	মল্লিকা সেনগুপ্ত	.....	সাম্প্রদায়িক
২০.	সুকান্ত ভট্টাচার্য	.....	প্রিয়তমাসু

ভারতীয় কবিতা

১.	আইয়াপ্পা পানিকর	.....	শিক্ষার সার্কাস
২.	মোহন ঠাকুরা	.....	ঈশ্বরের খোঁজে

আন্তর্জাতিক কবিতা

১.	বের্টোল্ট ব্রেখট	.....	পড়তে জানে এমন এক মজুরের প্রশ্ন
২.	ওয়ালট হুইটম্যান	.....	ঘাস

পূর্ণাঙ্গ বই

১.	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	.....	গুরু
২.	সুভাষ মুখোপাধ্যায়	.....	আমার বাংলা

নাটক

১.	বিজন ভট্টাচার্য	.....	আগুন
২.	শম্ভু মিত্র	.....	বিভাব
৩.	অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়	.....	নানা রঙের দিন
৪.	উৎপল দত্ত	.....	ইতিহাসের কাঠগড়ায়
৫.	বাদল সরকার	.....	ভুল রাস্তা
৬.	মনোজ মিত্র	.....	মঞ্চে চিত্রে
৭.	মোহিত চট্টোপাধ্যায়	.....	মাছি